অংশীদারী লেনদেন ঃ অংশীদারী ক্রয়বিক্রয়ের চার প্রকার থেকে তিন তিন প্রকারই বাতিল। প্রথম প্রকার, দু'ব্যক্তি নিজ নিজ পুঁজি পৃথক রেখে পৃথক ক্রয়বিক্রয় করে, কিন্তু একজন অপরজনকে বলে, যত টাকা লাভ অথবা লোকসান হবে, তাতে আমরা উভয়েই অংশীদার থাকব। এ ধরনের অংশীদারীকে 'শিরকতে মুফাওয়াযা' বলা হয়, যা বাতিল। দ্বিতীয় প্রকার, দু'ব্যক্তি নিজ নিজ কাজের মজুরিতে একে অপরের অংশীদারিত্ব শর্ত করে নেয়। 'শিরকতে অবদান' নামে অভিহিত এই অংশীদারীও বাতিল। তৃতীয় প্রকার, দু'ব্যক্তির একজন থাকে ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। ব্যবসায়ীরা তার কথা শুনে। সে অপরজনকে প্রভাব খটিয়ে পণ্যসামগ্রী নিয়ে দেয় এবং অপরজন তা বিক্রয় করে। এতে যা লাভ হয়, তাতে উভয়েই অংশীদার হয়। 'শিরকতে ওজুহ্' নামক এই অংশীদারীও বাতিল। চতুর্থ প্রকার, দু'ব্যক্তি নিজেদের টাকা পয়সা এমনভাবে মিলিয়ে দেয় যে, ভাগাভাগি না করলে তা পৃথক করা কঠিন হয়। এর পর প্রত্যেকেই একে অপরকে 'তাসাররুফ' তথা ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়। উভয়ে যে মুনাফা অর্জন করে, তাতে উভয়েই অংশীদার হয়। একে বলা হয় 'শিরকতে এনান'। এটা জায়েয ও বৈধ। এই অংশীদারীর বিধান হচ্ছে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুঁজির পরিমাণ অনুযায়ী লাভ-লোকসানে অংশীদার হবে। পুঁজি ছাড়া অন্য কিছুকে লাভ-লোকসান বন্টনের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা যাবে না। উদাহরণতঃ একজনের পুঁজি এক-তৃতীয়াংশ হলে সে লাভ-লোকসানের এক-তৃতীয়াংশ পাবে- অর্ধেক পাবে না। তাদের একজনকে বরখাস্ত করা হলে তার ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ হবে। বন্টনের ফলে পরস্পরের মালিকানা আলাদা হয়ে যাবে। বিশুদ্ধ উক্তি মতে, এই অংশীদারীত্ব অভিন্ন আসবাবপত্রের মাধ্যমেও জায়েয- নগদ পুঁজিরও প্রয়োজন নেই। মুযারাবা এরূপ নয়। তাতে নগদ পুঁজি থাকা জরুরী। সারকথা, ফেকাহ শাস্ত্রের এতটুকু শিক্ষা করা প্রত্যেক পেশাজীবীর জন্যে জরুরী। নতুবা অজ্ঞাতসারে হারামে লিপ্ত হয়ে যাবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লেনদেনে সুবিচারের গুরুত্ব এবং অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা

প্রকাশ থাকে যে, লেনদেন অনেক সময় এমনভাবে হয়, মুফতী যাকে শুদ্ধ ও জায়েয বলে। এ লেনদেন বাতিল না হলেও এতে এমন জুলুম থাকে, যে কারণে লেনদেনকারী আল্লাহ তাআলার ক্রোধানলে পতিত হয়। এখানে জুলুম বলে আমাদের উদ্দেশ্য এমন বিষয়, যা দ্বারা অপরের ক্ষতি হয়। এটা দু'প্রকার- এক, যার ক্ষতি ব্যাপক এবং দুই, যার ক্ষতি বিশেষভাবে লেনদেনকারী ভোগ করে। ব্যাপক জুলুমের অনেক ধরন রয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি আমরা এখানে উল্লেখ করছি। প্রথম, মূল্য বৃদ্ধির নিয়তে খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রাখা। এতে শস্য-বিক্রেতা শস্য গুদামজাত করে মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় বসে থাকে। এটা ব্যাপক জুলুমের কাজ। যে এরূপ করে, সে শরীয়তে নিন্দার যোগ্য। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من احتكر الطعام اربعين يوما ثم تصدق به لم تكن صدقته كفارة لاحتكاره -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি খাদ্য শস্য চল্লিশ দিন গুদামজাত করে রাখে, অতঃপর তা সদকা করে দিলেও তাতে আটকে রাখার কাফ্ফারা হবে না।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্য শস্য চল্লিশ দিন গুদামজাত করে রাখে, সে আল্লাহ তাআলার কোপানল থেকে অব্যাহতি পাবে না এবং আল্লাহ তাআলা তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যান। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, সে যেন একটি প্রাণ সংহার করে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্য শস্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত আটকে রাখে, তার অন্তর কঠোর হয়ে যায়। বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রাঃ) জনৈক গুদামজাতকারীর খাদ্য শস্য আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। একই হাদীসে খাদ্য শস্য গুদামজাত না করার সওয়াব সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি বাইরে থেকে খাদ্য শস্য ক্রয় করে আনে এবং সেদিনের দর অনুযায়ী বিক্রয় করে দেয়, সে যেন সেই খাদ্য শস্য খয়রাত করে দেয়। এক রেওয়ায়েতে আছে-

সে যেন একটি গোলাম মুক্ত করে দেয়। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ওয়াসেত থেকে এক নৌকা গম ক্রয় করে বসরায় প্রেরণ করেন এবং নিজের উকিলকে লেখে পাঠান, যেদিন নৌকা বসরায় প্রবেশ করবে, সেদিনই গম বিক্রয় করে দেবে,দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত বিলম্ব করবে না। ঘটনাক্রমে যেদিন পৌঁছল, সেদিন দাম কম ছিল। ব্যবসায়ীরা উকিলকে বলল ঃ এক সপ্তাহ পরে বিক্রয় করলে মুনাফা কয়েকগুণ বেশী হবে। উকিল এক সপ্তাহ অপেক্ষা করল এবং তাদের কথা অনুযায়ী বেশী লাভ হল। এর পর বুযুর্গ মালিকের কাছে এই সংবাদ লেখে পাঠালে তিনি জওয়াবে লেখলেন ঃ মিয়া, আমি অল্প লাভে সন্তুষ্ট ছিলাম, যাতে আমার দ্বীনদারী রক্ষা পায়। তুমি আমার কথার বিরুদ্ধে কাজ করেছ। আমার এটা কাম্য নয় যে, লাভ কয়েকগুণ বেশী হোক এবং এর বিনিময়ে আমার দ্বীনদারী হ্রাস পাক। তুমি বড় অন্যায় করেছ। এখন আমার পত্র পৌঁছামাত্র এর কাফ্ফারা হিসাবে সমস্ত মালপত্র বসরার ফকীরদেরকে খয়রাত করে দাও। সম্ভবত এতে আমি সওয়াব না পেলেও খাদ্য শস্য আটকে রাখার গোনাহ থেকে অব্যাহতি পাব।

প্রকাশ থাকে যে, খাদ্য শস্য আটকে রাখার নিষেধাজ্ঞা সর্বাবস্থায় থাকলেও এতে সময় ও বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। বস্তুর দিক দিয়ে নিষেধাজ্ঞা খাদ্য জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যাপক। সুতরাং কোন রকম খাদ্যই আটকে রাখা উচিত নয়। তবে যে সকল বস্তু মানুষের খাদ্য অথবা খাদ্যের সহায়ক নয়, তা খাওয়া হলেও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন ওষুধ, পক্ষী ছানা, জাফরান ইত্যাদি। যে বস্তু খাদ্যের সহায়ক, যেমন গোশত, ফলমূল এবং যা মাঝে মাঝে খাদ্যের স্থলবর্তী হয়ে যায়, যদিও সব সময় খাদ্য বলা হয় না, এরূপ বস্তু আটকে রাখা নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত কিনা, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কোন কোন আলেম এসব বস্তুকেও নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছেন। তারা ঘি, মধু, ঘন নির্যাস, পনীর, যয়তুনের তেল ইত্যাদি আটকে রাখা হারাম বলেছেন। কারও মতে এগুলো আটকে রাখার মধ্যে কোন দোষ নেই। সময়ের দিকে দিয়ে নিষেধাজ্ঞা কারও মতে সকল সময়ের জন্য ব্যাপক। বসরায় গম পৌঁছার যে কাহিনী একটু আগে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকেও একথাই বোঝা যায়। আবার কারও মতে নিষেধাজ্ঞা সকল সময়ে প্রযোজ্য নয়; বরং যে সময় দেশে খাদ্য শস্যের অভাব থাকে এবং মানুষ দুর্ভিক্ষাবস্থায় থাকে তখন

খাদ্য শস্য আটকে রাখা নিষিদ্ধ। আর যদি দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য শস্য থাকে এবং মানুষ অভাবগ্রস্ত না হয়, তখন খাদ্য শস্যের মালিক খাদ্য শস্য গুদামজাত করে রাখলে এবং দুর্ভিক্ষ কামনা না করলে তাতে কোন ক্ষতি হবে না। দুর্ভিক্ষের দিনে মধু, ঘি ইত্যাদি আটকে রাখলেও ক্ষতি হয়। অতএব আটকে রাখা হারাম হওয়া না হওয়া ক্ষতি হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। তবে ক্ষতি না হলেও খাদ্য শস্য আটকে রাখা মাকরূহ। কেননা, খাদ্য শস্যের মালিক ক্ষতির প্রত্যাশী না হলেও তার সূচনার প্রত্যাশা করে। অর্থাৎ দর বৃদ্ধি তার লক্ষ্য থাকে। স্বয়ং ক্ষতি করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি ক্ষতির ভূমিকা ও সূচনা তথা দর বৃদ্ধিও নিষিদ্ধ। তবে এর অনিষ্ট ক্ষতির অনিষ্টের তুলনায় কম। সুতরাং ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা কম বেশী হবে। সারকথা, খাদ্য শস্যের ব্যবসা পছন্দনীয় নয়। কেননা, ব্যবসা-বাণিজ্যের লক্ষ্য মুনাফা। খাদ্য শস্য মানুষের টিকে থাকার মূল বস্তু। মূনাফা যেহেতু মূল্যের অতিরিক্ত হয়ে থাকে, তাই এটা এমন সব জিনিসের মধ্যে কামনা করা উচিত, যা মানুষের মূল প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই জনৈক তাবেয়ী এক ব্যক্তিকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলেন ঃ তুমি তোমার পুত্রকে দুই বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে এবং দুই ধরনের পেশায় নিয়োজিত করো না। দু'রকম ক্রয়-বিক্রয়ের একটি হচ্ছে খাদ্য শস্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং অপরটি হচ্ছে কাফনের ক্রয়-বিক্রয়। কেননা, খাদ্য শস্য বিক্রেতা খাদ্য শস্যের দুর্মূল্য কামনা করে এবং কাফন বিক্রেতা মানুষের মৃত্যু কামনা করে। দুই পেশার মধ্যে একটি হচ্ছে কসাইগিরি– এতে অন্তর পাষাণ হয়ে যায় এবং অপরটি হচ্ছে স্বর্ণালংকার নির্মাণ। অলংকার নির্মাতারা দুনিয়ার মানুষকে সোনারূপা দ্বারা সজ্জিত করে দিতে চায়।

ব্যাপক ক্ষতির দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, অচল টাকা দেয়া। লেনদেনকারী না জেনে শুনে অচল টাকা রাখলে এতে তার ক্ষতি হয়। ফলে এটা জুলুম। আর যদি কেউ জেনে শুনে রাখে, তবে সে অপরকে দেবে । এভাবে যার হাতেই যাবে, সে অপরকে দেবে এবং সকলের গোনাহ প্রথম ব্যক্তির উপর বর্তাবে। কেননা, সেই এই কুপ্রথার প্রচলনকারী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কুকর্মের প্রচলন করে এবং তার পরে অন্যেরা তা পালন করে তার উপর এই কুকর্মের গোনাহ হবে এবং যারা তার পরে তা তা পালন করে, তাদের গোনাহও তার উপর চাপাবে

এবং তাদের গোনাহ হ্রাস করা হবে না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ একটি অচল টাকা প্রচলিত করা একশ' টাকা চুরি করার চেয়েও গুরুতর পাপ। কেননা, চুরি একটি নাফরমানী, যা চোরের মৃত্যুর পর খতম হয়ে যায়, কিন্তু অচল টাকা প্রচলিত করা একটি বেদআত- যা প্রচলনকারী উদ্ভাবন করে। এটা শত শত বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। যে পর্যন্ত সেই টাকা চলতে থাকবে, তাতে মানুষের ধন-সম্পদে যে অনিষ্ট ও ক্ষতি হবে, তার পাপও মরে যায় এবং অত্যন্ত দুর্ভোগ সে ব্যক্তির জন্যে, যে নিজে মরে যায় কিন্তু তার গোনাহ একশ দু'শ বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে এবং এ কারণে সে কবরে আযাব ভোগ করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ অর্থাৎ, আমি তাদের পেছনে ছেড়ে যাওয়া কীর্তিসমূহও লিপিবদ্ধ করব, যেমন তাদের সেই আমল লিপিবদ্ধ করব, যা তারা জীবদ্দশায় করে।

আরও এরশাদ হয়েছে- يُنَبَّأُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ

অর্থাৎ, মানুষকে সেদিন বলে দেয়া হবে যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং যা পেছনে ছেড়ে এসেছে। এখানে যা পেছনে ছেড়ে এসেছে বলে সেই কুকীর্তি বুঝানো হয়েছে, যার প্রচলন মানুষ করে যায় এবং তার মৃত্যুর পর অন্যেরা তা করে। এখন জানা উচিত, অচল টাকা সম্পর্কে পাঁচটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, এরূপ টাকা দ্বীনদার ব্যবসায়ীর হাতে এলে তার উচিত টাকাটি কূপে নিক্ষেপ করা, যাতে পরে কারও হাতে না পড়ে। একে ভেঙ্গে ব্যবহারের অযোগ্য করে দেয়াও জায়েয। দ্বিতীয়, ব্যবসায়ীর উচিত টাকা পয়সা পরখ করার পদ্ধতি শিখে নেয়া, যাতে সে তার হাত দিয়ে কোন মুসলমানকে অচল টাকা দিয়ে গোনাহগার সাব্যস্ত না হয়। তৃতীয়, যদি কেউ লেনদেনকারীকে এরূপ টাকা দিয়ে বলে দেয় যে, এই টাকা অচল, তবুও সে গোনাহের গন্ডির বাইরে থাকবে না। কেননা, যে এরূপ টাকা নেয়, সে অপরকে তার অজ্ঞাতে দেয়ার জন্যেই নেয়। এরূপ নিয়ত না থাকলে কখনই তা নিত না। চতুর্থ, হাদীসে বলা হয়েছে-

رحم الله سهل البيع وسهل الشراء وسهل القضاء وسهل الاقتضاء۔

অর্থাৎ, আল্লাহ রহম করুন বিক্রয়ে নম্রতাকারীর প্রতি এবং ক্রয়ে নম্রতাকারীর প্রতি।

হাদীসের এই দোয়ার বরকতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নিয়তে অচল টাকা গ্রহণ করবে এবং টাকাটি কূপে নিক্ষেপ করার অবিচল ইচ্ছা রাখবে। পঞ্চম, আমাদের মতে অচল টাকার অর্থ সেই টাকা, যাতে রূপা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত- কেবল গিল্টিই গিল্টি থাকে অথবা আশরাফী হলে তাতে স্বর্ণের নামগন্ধও থাকে না। যে টাকায় রূপা ও গিল্টি মিশ্রিত থাকে, যদি শহরে এরূপ টাকার প্রচলন থাকে, তবে তা দ্বারা লেনদেন করার ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমাদের মতে শহরে প্রচলন থাকলে তা দ্বারা লেনদেন করা জায়েয- রূপার পরিমাণ জানা থাক বা না থাক। শহরে প্রচলন না থাকলে তা দ্বারা লেনদেন তখনই জায়েয হবে, যখন তার রূপার পরিমাণ জানা থাকবে। মোট কথা, ব্যবসা বাণিজ্যে খুঁটিনাটি বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা নফল এবাদতে মশগুল হওয়ার চেয়েও অধিক সওয়াবের কারণ। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সাধু ব্যবসায়ী আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয় প্রকার জুলুমের কারণে বিশেষভাবে লেনদেনকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, মুসলমান ভাইয়ের ক্ষতি না করাকে বলা হয় আদল বা সুবিচার। এ সম্পর্কে সামগ্রিক নীতি হল, অপরের জন্যে তাই পছন্দ করা যা নিজের জন্যে পছন্দ করা হয়। সুতরাং যে আচরণ তোমার সাথে কেউ করলে তোমার খারাপ লাগে, সে ব্যবহার অন্যের সাথে তোমার করা কিছুতেই সমীচীন নয়। তোমার কাছে নিজের টাকার মর্যাদা ও অপরের টাকার মর্যাদা সমান হওয়া উচিত। এই সামগ্রিক নীতির বিশদ বিবরণ চারটি বিষয়ের মধ্যে সীমিত। প্রথম, পণ্যসামগ্রীর গুণস্বরূপ এমন বিষয় বর্ণনা করবে না, যা তাতে নেই। দ্বিতীয়, পণ্যসামগ্রীর গোপন দোষ কোন অবস্থাতেই গোপন করবে না। তৃতীয়, পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ ও ওজন সম্পর্কে কোন বিষয় অস্পষ্ট রাখবে না। চতুর্থ, পণ্যের প্রকৃত দর গোপন রাখবে না যে, প্রতিপক্ষ দর জানার পর সে জিনিস ক্রয় করতে অস্বীকার করে। এখন এই বিষয় চতুষ্টয়ের বিস্তারিত বর্ণনা শোনা দরকার।

প্রথম বিষয়, পণ্যসামগ্রীর অতিরিক্ত প্রশংসা না করা। কেননা, প্রশংসা করা দু'অবস্থা থেকে খালি নয়- প্রথমতঃ এমন বিষয় বর্ণনা

করবে, যা জিনিসের মধ্যে বাস্তবে নেই। এটা পরিষ্কার মিথ্যাচার। ক্রেতা তার কথা বিশ্বাস করলে মিথ্যা ছাড়া জুলুম এবং প্রতারণার দায়েও তাকে অভিযুক্ত করা হবে। দ্বিতীয়তঃ এমন বিষয় বর্ণনা করবে, যা জিনিসের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে এবং বর্ণনা না করলেও ক্রেতা তা জানতে পারবে। এমতাবস্থায় তার বর্ণনা বাজে ও অনর্থক কথা হবে। এই অনর্থক কথার জন্যে তাকে আল্লাহ তাআলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, আল্লাহ বলেন ঃ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থাৎ মানুষ যা-ই উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তৎপর প্রহরী তার কাছেই রয়েছে।

হাঁ, যদি এমন অভ্যন্তরীণ বিষয় বর্ণনা করে, যা বর্ণনা না করলে ক্রেতা জানতে পারে না, তবে তাতে কোন দোষ হবে না যদি অতিরঞ্জিত না হয়, কিন্তু এসব বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে কসম খাবে না। হাদীসে আছে– দুর্ভোগ সেই ব্যবসায়ীর জন্যে, যে বলে, হাঁ আল্লাহর কসম, না, আল্লাহর কসম এবং দুর্ভোগ সেই কারিগরের জন্যে, যে কাল ও পরশুর ওয়াদা করে। অন্য এক হাদীসে আছে– মিথ্যা কসম পণ্যদ্রব্যকে প্রসার দেয়, কিন্তু উপার্জন মিটিয়ে দেয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না– অহংকারী, দান করে অনুগ্রহ প্রকাশকারী এবং কসমের মাধ্যমে আপন পণ্যসামগ্রীকে প্রসারদাতা।

দ্বিতীয়, পণ্যের বাহ্যিক ও গোপন সকল দোষ প্রকাশ করবে। কিছুই চেপে যাবে না। কোন দোষ গোপন করলে বিক্রেতা জালেম ও প্রতারক হবে। প্রতারণা হারাম। কাপড়ের ভাল পিঠ প্রকাশ করলে এবং অপর পিঠ গোপন রাখলে প্রতারণা হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক শস্য বিক্রেতার কাছে গেলেন। তার শস্য খুব ভাল দেখাচ্ছিল। তিনি শস্যস্তূপের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কিছু আর্দ্রতা অনুভব করে বললেন ঃ একি! দোকানদার বললঃ এটা বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তা হলে তুমি ভিজা খাদ্য শস্য উপরে রাখলে না কেন? শুন, যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়। দোষ বলে দিয়ে মুসলমানদের শুভ কামনা করা যে ওয়াজিব, তা এই হাদীস দ্বারা জানা যায়– হযরত জারীর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে ইসলামের বয়াত করার পর প্রস্থানোদ্যত হলে

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কাপড় ধরে টান দেন এবং তাকে বসতে বলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে শুভ কামনা করা তার ইসলামের জন্যে শর্ত সাব্যস্ত করে দেন। এর পর থেকে হযরত জারীরের নিয়ম ছিল, তিনি যখনই কোন পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করতেন, তখন তার দোষ ক্রেতাকে ভাল করে দেখিয়ে দিয়ে বলতেন ঃ এখন তুমি ইচ্ছা করলে ক্রয় কর, ইচ্ছা না হয় ক্রয় না কর। লোকেরা তাকে বলল ঃ এরূপ করলে তোমার বিক্রয় কোনটিই পূর্ণ হবে না। তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে অঙ্গীকার করেছি, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে শুভ কামনা করব। অর্থাৎ, এভাবে বিক্রয় না করলে অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ হবে। একবার ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রাঃ) বাজারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার কাছেই এক ব্যক্তি তার উষ্ট্রী বিক্রয় করছিল। ক্রেতা উষ্ট্রীর দাম তিনশ' দেরহাম বিক্রেতাকে দিয়ে চলে যেতে লাগল। হযরত ওয়াসেলা তখন অন্যমনস্ক ছিলেন। তিনি যখন ক্রেতাকে উষ্ট্রি নিয়ে চলে যেতে দেখলেন, তখন তার পেছনে দৌড় দিলেন এবং ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এই উষ্ট্রী গোশতের জন্যে ক্রয় করেছ, না সওয়ারীর জন্যে? ক্রেতা বলল ঃ সওয়ারীর জন্যে। ওয়াসেলা বললেন ঃ আমি এর পায়ে একটি ফাটল দেখেছি। এটি মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করে চলতে সক্ষম হবে না। অতঃপর ক্রেতা ফিরে এসে উষ্ট্রী বিক্রেতার হাতে ফিরিয়ে দিল। বিক্রেতা তার দাম আরও একশ' দেরহাম হ্রাস করে ওয়াসেলাকে বলল ঃ আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, তুমি আমার বিক্রয় নস্যাৎ করে দিয়েছ। ওয়াসেলা বললেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অঙ্গীকার করেছি, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে শুভ কামনা করব। তিনি আরও বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি

لا يحل لاحد يبيع بيعا الا ان يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك الا تبينه -

অর্থাৎ পণ্যের দোষ বর্ণনা না করে পণ্য বিক্রয় করা কারও জন্যে হালাল নয়। আর যে ব্যক্তি সেই দোষ জানে, তার জন্যে বর্ণনা না করে থাকা জায়েয নয়। মোট কথা, পূর্ববর্তীরা মুসলমানের শুভ কামনাকে একটি অতিরিক্ত ফযীলতের বিষয় মনে করতেন না; বরং তারা বিশ্বাস করতেন, এটা ইসলামের অন্যতম শর্ত এবং বয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এটা

অধিকাংশ মানুষের জন্যে কঠিন। তাই সৎ ও সাবধানী ব্যক্তিরা এসব ঝগড়ায় পড়ে না। তারা নির্জনবাস অবলম্বন করে খাঁটি এবাদত করে। কেননা, মানুষের সাথে মিলেমিশে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করা এমন দুরূহ প্রচেষ্টা, যা সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ করতে পারে না। দু'টি বিষয় বিশ্বাস করা ব্যতীত এ কাজ মানুষের জন্যে সহজ হয় না। প্রথমতঃ বিশ্বাস করতে হবে যে, দোষ গোপন করে বিক্রয় করলে রুযী বৃদ্ধি পায় না, বরং বরকত দূর হয়ে যায় এবং এই বিচ্ছিন্ন পাপ একত্রিত হয়ে একদিন হঠাৎ সমস্ত সম্পদ বিলীন করে দেয়। সেমতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তির একটি গাভী ছিল। সে তার দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রয় করত। একবার এমন এক বন্যা এল যা তার গাভীটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। লোকটির ছেলে বলল ঃ এই সে বিচ্ছিন্ন পানি, যা আমরা দুধের সাথে মিশ্রিত করেছিলাম, হঠাৎ একত্রিত হয়ে আমাদের গাভী ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

البيعان اذا صدقا فى بيعهما وانصحا بورك لهما فى بيعهما واذا كتما وكذبا نزعت بركة بيعهما -

অর্থাৎ, যখন ক্রেতা-বিক্রেতা সত্য কথা বলে এবং একে অপরের শুভ কামনা করে, তখন তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দেয়া হয়। আর যখন তারা দোষ গোপন করে এবং মিথ্যা বলে, তখন তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত ছিনিয়ে নেয়া হয়। এক হাদীসে আছে–

يد الله على الشريكين مالم يتخاونا واذا تخاونا رفع يده عنهما -

আল্লাহ তা'আলার সাহায্য দুই শরীকের উপর ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ তারা খেয়ানত না করে। আর যখন খেয়ানত করে, তখন তাঁর সাহায্যের হাত তাদের উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হয়।

মোট কথা, খেয়ানতের মাধ্যমে অর্থসম্পদ বৃদ্ধি পায় না, যেমন খয়রাত করলে তা হ্রাস পায় না। যে ব্যক্তি মাপ ব্যতীত অন্য কোনভাবে হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে বলে স্বীকার করে না, সে আমাদের এই বক্তব্য বিশ্বাস করবে না, কিন্তু যে জানে, মাঝে মাঝে এক টাকার বরকত দ্বারা দীন দুনিয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যায় এবং কখনও আল্লাহ তা'আলা

হাজার হাজার টাকা থেকে বরকত এমনভাবে তুলে নেন যে, সেই টাকা মালিকের ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়, ফলে সে বলতে বাধ্য হয়, হায়, আমার কাছে যদি এত টাকা না থাকত। সে একথার সত্যতা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, খেয়ানত দ্বারা ধন বৃদ্ধি পায় না এবং খয়রাত দ্বারা হ্রাস পায় না। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বাস করতে হবে, পরকালের কল্যাণ দুনিয়ার কল্যাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধনসম্পদের উপকারিতা বয়ঃক্রম শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় এবং বান্দার হক ঘাড়ে থেকে যায়। এমতাবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিরূপে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করার বিনিময়ে উৎকৃষ্ট বস্তু হাতছাড়া করা পছন্দ করবে? বলাবাহুল্য, ধর্মের নিরাপত্তা সবকিছুর উর্ধ্বে ও উৎকৃষ্ট। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ যে পর্যন্ত পার্থিব ব্যাপারাদিকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার না দেয়, সেই পর্যন্ত কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মানুষের উপর থেকে আল্লাহর গজব দূর করতে থাকে। মোট কথা, ক্রয়-বিক্রয় হোক কিংবা কারিগরি, সকল ক্ষেত্রেই প্রতারণা হারাম। কারিগরেরও উচিত তার কাজে এমন শৈথিল্য না করা, যা তার নিজের দেয়া কাজে অন্য কারিগর করলে সে তা পছন্দ করবে না। কারিগর সুন্দর ও মজবুত কাজ করবে এবং তাতে কোন দোষ থাকলে তা বলে দেবে । এভাবে সে শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে। কেউ বলতে পারে, পণ্যের দোষ বর্ণনা করা ব্যবসায়ীর উপর ওয়াজিব হলে তার ব্যবসা শিকায় উঠতে বাধ্য। এর জওয়াব হচ্ছে, ব্যবসায়ী প্রথমেই নির্দোষ পণ্য ক্রয় করবে, যা বিক্রয় না হলে সে নিজের জন্যে রেখে দিতে পারে। এছাড়া অল্প লাভে বিক্রয় করবে। এতে আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদে বরকতও দেবেন এবং ধোঁকা দেয়ারও প্রয়োজন হবে না, কিন্তু মুশকিল হল, মানুষ অল্প লাভে সন্তুষ্ট হয় না এবং অনেক লাভ প্রতারণা ছাড়া পাওয়া যায় না। সুতরাং সুষ্ঠুরূপে ব্যবসা করলে এমন দোষী পণ্য ক্রয় করবে না, যা বর্ণনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যদি ঘটনাক্রমে এমন কোন বস্তু এসে যায়, তবে তার দোষ বলে দেবে এবং দোষসহ তার যা দাম হয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে।

হযরত ইবনে সিরীন (রহঃ) একটি ছাগল বিক্রয় করে ক্রেতাকে বললেন ঃ এর একটি দোষ আছে, সেটাও শুন। সে ঘাস পায়ে মাড়িয়ে দেয়। হাসান ইবনে সালেহ এক বাঁদী বিক্রয় করে ক্রেতাকে বললেন ঃ আমার এখানে থাকা অবস্থায় একবার তার নাক দিয়ে রক্ত বের হয়েছিল।

মোট কথা, বুযুর্গগণ লেনদেনে সামান্য বিষয়ও বলে দিতেন।

তৃতীয়, পণ্যের পরিমাণ ও ওজন গোপন করবে না। সমান মাপ এবং সাবধানতা সহকারে মাপার মাধ্যমে তা অর্জিত হয়। সুতরাং অন্যের কাছ থেকে যে মাপ নেবে অন্যকেও সেভাবে মেপে দেবে । আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ -

অর্থাৎ, মাপে প্রবঞ্চনাকারীদের জন্যে দুর্ভোগ, যারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন মানুষকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।

এ থেকে মুক্তির উপায় এটাই যে, অপরকে মেপে দেয়ার সময় পাল্লা কিছু ঝুঁকিয়ে দেবে এবং নিজে নেয়ার সময় সমানের চেয়ে কিছু কম নেবে। কেননা, ঠিক সমান খুব কমই হতে পারে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি এক রতির বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে দুর্ভোগ ক্রয় করব কেন? তাই তিনি নিজের হক নেয়ার সময় আধা রতি কম নিতেন এবং অপরকে দেয়ার সময় এক রতি বেশী দিতেন। তিনি আরও বলতেন ঃ সে ব্যক্তির জন্যে দুর্ভোগ, যে এক রতির বিনিময়ে জান্নাত বেচে দেয়, যে জান্নাতের বিনিময় আকাশ ও পৃথিবীর সমান। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ ধরনের বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে জোর তাকিদ করেছেন। কেননা, এগুলো বান্দার হক, যা থেকে তওবা হতে পারে না। কেননা, এখানে কার কার হক রয়ে গেছে, তা জানা থাকে না। জানা থাকলে অবশ্য তাদেরকে জড়ো করে হক শোধ করা যেত। রসূলে করীম (সাঃ) কোন বস্তু ক্রয় করার পর যে মূল্য ওজন করত, তাকে বলতেন ঃ زن وارجح অর্থাৎ, মূল্য ওজন কর এবং ঝুঁকিয়ে দাও। ফোযায়ল (রহঃ) একবার তাঁর পুত্রকে একটি আশরাফী ধৌত করতে দেখলেন। আশরফীটি ভাঙ্গানো উদ্দেশ্য ছিল। তাই তা থেকে ময়লা পরিষ্কার করা হচ্ছিল, যাতে ময়লার কারণে তার ওজন বেশী না হয়ে যায়। ফোযায়ল বললেন ঃ বৎস, তোমার এ কাজ দু'টি হজ্জ ও দশটি ওমরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি একথা ভেবে অবাক হই যে, সেই ব্যবসায়ী ও বিক্রেতার নাজাত কিরূপে হবে, যারা দিনের বেলায় মাপজোখ করে এবং রাতে ঘুমিয়ে

থাকে।। হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ হে কলিজার টুকরা, সর্প যেমন দুই পাথরের মাঝখানে ঢুকে পড়ে, তেমনি পাপ দুই লেনদেনকারীর মাঝখানে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়।

সারকথা, দাঁড়িপাল্লার ব্যাপারটি খুবই গুরুতর। এক আধ রতি দিয়ে এ থেকে নাজাত পাওয়া সম্ভব। যে ব্যক্তি নিজের হক অন্যের কাছ থেকে আদায় করে এবং যেভাবে আদায় করে সেভাবে অন্যের হক শোধ করে না, সে-ও মাপে প্রবঞ্চনাকারীদের সম্পর্কিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আয়াতে মাপের জিনিসসমূহে সমান সমান না করা হারাম করার উদ্দেশ্য এটাই যে, ন্যায় ও ইনসাফ বর্জন করা হারাম। এটা প্রত্যেক কাজেই হতে পারে। যে ব্যক্তি খাদ্য শস্যে মাটি মিশ্রিত করে বিক্রয় করবে, সে মাপে প্রবঞ্চনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে যে কসাই গোশতের সাথে এমন হাড্ডি মেপে দেবে, যা সাধারণভাবে মাপা হয় না, তার অবস্থাও তেমনি হবে। বস্ত্র বিক্রেতা যখন গজ দিয়ে বস্ত্র মেপে ক্রয় করে, তখন বস্ত্রকে ঢিলা রাখে; কিন্তু বিক্রয় করার সময় খুব টেনে মাপে, যাতে কিছু বেড়ে যায়। এ ধরনের সব কাজকর্ম মানুষকে আয়াতে বর্ণিত দুর্ভোগের উপযুক্ত করে দেয়।

চতুর্থ, পণ্যের দর সত্য সত্য বলবে– কিছুই গোপন করবে না। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) শহরের বাইরে গিয়ে শহরে আগমনকারী কাফেলার কাছ থেকে মিথ্যা দর শুনিয়ে পণ্য ক্রয় করতে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ لاتلقوا الركبان ومن تلقها فصاحب السلعة بالخيار بعد ان يقدم السوق অর্থাৎ, বাইরের সওদাগরদের কাছ থেকে এগিয়ে গিয়ে ক্রয় করো না। কেউ এরূপ ক্রয় করলে বাজারে আসার পর পণ্যের মালিকের এখতিয়ার থাকবে– ইচ্ছা করলে বিক্রয় বহাল রাখবে এবং ইচ্ছা করলে ক্রেতার কাছ থেকে পণ্য ফেরত নেবে। অর্থাৎ, বিক্রেতা যদি জানতে পারে, ক্রেতা মিথ্যা দর বলেছিল, তবে তার এই এখতিয়ার থাকবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লেনদেনে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা আদল (ন্যায়বিচার) এবং 'এহসান' (অনুগ্রহ প্রদর্শন) উভয়টিরই নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ -

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের নির্দেশ দেন। ন্যায়বিচার মুক্তির কারণ। এটা ব্যবসা-বাণিজ্যের পুঁজি বেঁচে থাকার মত। অনুগ্রহ প্রদর্শন পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জনের কারণ। এটা ব্যবসায়ে মুনাফা হওয়ার অনুরূপ। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মূল্য পাওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে এবং আসল মুনাফা অন্বেষণ করে না, তাকে বুদ্ধিমান গণ্য করা হয় না। তেমনি পারলৌকিক লেনদেনেও যে ব্যক্তি কেবল ন্যায়বিচার ও জুলুম বর্জন করেই ক্ষান্ত থাকে, অনুগ্রহ প্রদর্শন করে না, তাকে ধর্মপরায়ণ বলা যায় না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ -

অর্থাৎ, অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। আর বলা হয়েছে-

إِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ -

অর্থাৎ, আল্লাহর রহমত অনুগ্রহ প্রদর্শনকারীদের নিকটবর্তী। অনুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য এমন কাজ করা, যদ্দ্বারা লেনদেনকারীদের উপকার হয়; কিন্তু তা করা ওয়াজিব নয়; বরং নিজের পক্ষ থেকে সদাচরণস্বরূপ করা হয়। কেননা, যেসব কাজ করা ওয়াজিব, সেগুলো ন্যায়বিচার ও জুলুম বর্জনের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ছয়টি বিষয়ের মধ্য থেকে কোন একটি পালন করার মাধ্যমে অনুগ্রহ প্রদর্শনের স্তর অর্জিত হয়। প্রথমতঃ অন্যের এমন লোকসান না করা, যা সাধারণতভাবে করা হয় না। কিছু না কিছু লোকসান করার অনুমতি রয়েছে। কেননা, ক্রয়বিক্রয় মুনাফার জন্যে করা হয়। আর কিছু বেশী নেয়া ছাড়া মুনাফা হতে পারে না। এই বেশী নেয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সাধারণ নিয়মের বেশী না হয়। কেননা, যে ক্রেতা সাধারণ

নিয়মের বেশী মুনাফা দেবে, সে হয় এই পণ্যের প্রতি অধিক আগ্রহী হবে, না হয় আপাততঃ এর প্রয়োজন তার অধিক হবে। এমতাবস্থায় যদি বিক্রেতা অধিক মুনাফা না নেয়, তবে এটা তার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ হবে। অন্যথায় প্রতারণা না হলে সম্ভবতঃ বেশী মুনাফা নেয়া জুলুম নয়। কোন কোন আলেমের মতে মূল্যের এক-তৃতীয়াংশের বেশী মুনাফা নিলে ক্রেতা জানার পর পণ্য ফেরত দেয়ার অধিকারী হবে, কিন্তু আমাদের অভিমত তা নয়, বরং আমরা বলি, কম মুনাফা নেয়া অনুগ্রহের শামিল।

কথিত আছে, ইউনুস ইবনে ওবায়দের দোকানে বিভিন্ন দামের বস্ত্রজোড়া ছিল, কোনটি চারশ' দেরহামের এবং কোনটি দু'শ দেরহামের। একদিন তিনি যখন তাঁর ভাতিজাকে দোকানে রেখে নামায পড়তে গেলেন, তখন এক বেদুঈন এসে একটি চারশ' দেরহামের বস্ত্রজোড়া চাইল। ভাতিজা দু'শ দেরহামের বস্ত্রজোড়া থেকে একটি বের করে দেখাল। বেদুঈন পছন্দ করে সানন্দে চারশ' দেরহাম দিয়ে দিল এবং বস্ত্রজোড়াটি হাতে নিয়ে চলে যেতে লাগল। পথিমধ্যে ইউনুস ইবনে ওবায়দ নিজের দোকানের বস্ত্রজোড়া চিনতে পেরে বেদুঈনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কত দিয়ে কিনলে? বেদুঈন বলল ঃ চারশ' দেরহাম দিয়ে। ইউনুস বললেন ঃ এর দাম দু'শ দেরহামের বেশী নয়। এটা ফেরত দাও। বেদুঈন বলল ঃ আমাদের শহরে এটা পাঁচশ' দেরহামের মাল। আমি সানন্দে এটা পছন্দ করেছি এবং চারশ' দেরহাম দিয়েছি। অতঃপর ইউনুস তাকে অনেকটা জোর করেই দোকানে নিয়ে গেলেন এবং দু'শ' দেরহাম ফেরত দিলেন। এর পর তিনি ভাতিজাকে শাসিয়ে বললেন ঃ এত মুনাফা লুটতে এবং মুসলমানদের শুভ কামনা বর্জন করতে তোর লজ্জা হল না? ভাতিজা বললেন ঃ সে তো নিজেই এত দেরহাম দিতে রাজি ছিল। তিনি বললেন ঃ তা হলে নিজের জন্যে যা পছন্দ করতে, তার জন্যে তা পছন্দ করলে না কেন? এ কাজটিই যদি দাম গোপন করে প্রতারণার মাধ্যমে হত, তবে তা হত এক প্রকার জুলুম, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে আছে–

غبن المرسل حرام -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের উপর আস্থা রাখে, তাকে ধোঁকা দেয়া হারাম। যোবায়র ইবনে আদী বলতেন ঃ আমি আঠার জন সাহাবীকে এমন দেখেছি যে তাঁরা ভাল করে এক দেরহামের গোশতও কিনতে

জানতেন না। অতএব এমন আত্মভোলাদের ক্ষতি করা এবং তাঁদেরকে ধোঁকা দেয়া জুলুম। অধিক লাভ নেয়ার ক্ষেত্রে কোন না কোন প্রকার ধোঁকা কিংবা সমকালীন দর গোপন করা প্রায়ই হয়ে থাকে। অনুগ্রহ প্রদর্শনের এক পন্থা হযরত সিররী সকতী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি ষাট দীনার মূল্য দিয়ে এক বস্তা বাদাম ক্রয় করেন এবং আপন ডায়রীতে তার মুনাফা তিন দীনার লেখে রাখেন। অর্থাৎ, তিনি প্রতি দশ দীনারে আধা দীনার মুনাফা ঠিক করলেন। এর পর বাদামের দর বেড়ে গেল এবং নব্বই দীনার প্রতি বস্তা বিক্রি হতে লাগল। জনৈক খরিদ্দার তাঁর কাছে এসে বাদামের বস্তা ক্রয় করতে চাইল। তিনি বললেন ঃ নিয়ে যাও। খরিদ্দার দাম জিজ্ঞেস করলে তিনি তেষট্টি দীনার বললেন। খরিদ্দারও সৎ ও সাধু ব্যবসায়ী ছিল। সে বলল ঃ বর্তমান দর প্রতি বস্তা নব্বই দীনার। সিররী সকতী বললেন ঃ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, এর বেশী নেব না। তেষট্টি দীনারেই বিক্রয় করব। খরিদ্দার বলল ঃ আমিও আল্লাহ তাআলার সাথে অঙ্গীকার করেছি, কোন মুসলমানের ক্ষতি করব না। অতএব নব্বই দীনার দিয়েই নেব। ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন ঃ এর পর না সিররী নব্বই দীনার দিয়েই বিক্রয় করলেন এবং না খরিদ্দার তেষট্টি দীনারে ক্রয় করল। এটা ছিল তাঁদের উভয়ের তরফ থেকে অনুগ্রহ প্রদর্শন।

বর্ণিত আছে, মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদেরের বস্ত্রালয়ে কিছু চোগা (পোশাক বিশেষ) ছিল। কিছু পাঁচ টাকা দামের এবং কিছু দশ টাকা দামের। গোলাম তাঁর অনুপস্থিতিতে পাঁচ টাকার চোগা দশ টাকায় বিক্রয় করেছে। ক্রেতা বলল ঃ কোন দোষ নেই। আমি রাজি আছি। তিনি বললেন ঃ আপনি রাজি বটে; কিন্তু আমি আপনার জন্যে তাই পছন্দ করি, যা নিজের জন্যে পছন্দ করি। আপনি তিনটি কাজের একটি করুন– হয় দশ টাকা মূল্যের চোগা নিয়ে নিন, না হয় পাঁচ টাকা ফেরত নিন, না হয় আমার বস্ত্র আমাকে ফেরত দিন এবং আপনার মূল্য নিয়ে যান। ক্রেতা বলল ঃ আমাকে পাঁচ টাকা ফেরত দিন। তিনি পাঁচ টাকা দিয়ে দিলেন। ক্রেতা পাঁচ টাকা নিয়ে চলে গেল এবং মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করল ঃ এই দোকানদার কে? এক ব্যক্তি বলল ঃ ইনি মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের। ক্রেতা বলল ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাঁরই বদৌলত দুর্ভিক্ষে আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষিত হয়। মোট কথা, অনুগ্রহ প্রদর্শন হল, যে

জায়গায় যে বস্তুতে যে পরিমাণ মুনাফা নেয়ার সাধারণ রীতি থাকে, তার চেয়ে বেশী না নেয়া। যে ব্যক্তি অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকে, তার দোকানে লেনদেন বেশী হয় এবং বেশী লেনদেনের কারণে তাঁর ফায়দাও বেশী হয়। ফলে বরকত দেখা যায়। হযরত আলী (রাঃ) কুফার বাজারে দোররা নিয়ে ঘুরাফেরা করতেন এবং বলতেন ঃ ব্যবসায়ীরা, নিজেদের হক নাও এবং অন্যের হক দাও। এতে তোমরা বেঁচে থাকবে। অল্প লাভ ফিরিয়ে দিয়ো না। তা হলে বেশী লাভ থেকে বঞ্চিত থাকবে। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার ধন-দৌলত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ তিনটি– প্রথমতঃ আমি অল্প মুনাফা হলেও পণ্য বিক্রি করে দেই। দ্বিতীয়তঃ কেউ আমার কাছে জন্তু চাইলে আমি তা বিক্রি করতে দ্বিধা করি না। তৃতীয়তঃ আমি কখনও বাকী বিক্রি করি না।

কথিত আছে, একবার তিনি এক হাজার উষ্ট্রী বিক্রি করেন। লাভের মধ্যে কেবল এগুলোর রশি তাঁর কাছে রইল। এর পর প্রত্যেকটি রশি এক দেরহামে বিক্রয় করে তিনি এক হাজার দেরহাম মুনাফা অর্জন করেন। আর এক হাজার সেদিনের খোরাক থেকে বেঁচে গেল।

দ্বিতীয়, কোন দুর্বল অথবা নিঃস্ব ব্যক্তির কাছ থেকে কোন জিনিস ক্রয় করলে নিজে কিছু লোকসান স্বীকার করে নিলে দুর্বল ও নিঃস্ব ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। এভাবে ক্রেতা এই হাদীসে বর্ণিত দোয়ার হকদার হয়ে যাবে–

رحم الله سهل البيع سهل الشراء ۔

অর্থাৎ, যে ক্রয় ও বিক্রয় সহজ করে, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। তবে যে ধনী ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত মুনাফা নেয়, তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা ভাল নয়; বরং বিনা সওয়াবে অর্থ বিনষ্ট করার শামিল। এক হাদীসে আছে– الغبون فى الشراء لامحمود ولا ماجور যে ব্যক্তি ক্রয়ে ঠকে যায়, সে প্রশংসার পাত্রও নয় এবং তাকে সওয়াবও দেয়া হয় না। বসরার কাযী ও তাবেয়ী আয়ায ইবনে মুয়াবিয়া অত্যন্ত চতুর লোক ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ না আমি ধূর্ত এবং না কোন ধূর্ত আমাকে ঠকাতে পারে। অপরকে না ঠকানো এবং নিজে না ঠকাই বাহাদুরী। হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রশংসায় কেউ কেউ লেখেছেন, তাঁর

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি কাউকে ধোঁকা দিতেন না এবং কেউ তাঁকে ধোঁকা দিতে পারত না। হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইন (রাঃ) ক্রয় বিক্রয় করার সময় খুব যাচাই করে নিতেন এবং সামান্য বিষয়ের জন্যে অনেক কথা বলতেন; কিন্তু কাউকে দেয়ার সময় অনেক বেশী দিয়ে দিতেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন ঃ যে দেয়, সে নিজের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব দেয়। কাজেই যত দেবে তত বেশী তার ফযীলত জানা যাবে। পক্ষান্তরে ক্রয়বিক্রয়ে যে ঠকে যায় সে তার বুদ্ধি হ্রাস করে; অর্থাৎ, ঠকা হল বুদ্ধির ত্রুটি।

তৃতীয়, মূল্য ও ঋণ শোধ নেয়ার সময় ত্রিবিধ উপায়ে অনুগ্রহ প্রদর্শন হতে পারে। এক, কিছু মাফ করে দিয়ে, দুই, আর কিছু সময় দিয়ে এবং তিন, দাম নেয়ার ব্যাপারে নম্রতা করে। এগুলো মোস্তাহাব। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি দরিদ্রকে সময় দেয় অথবা তার ঋণ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ্ তাআলা তার কাছ থেকে অল্প ও সহজ হিসাব নেবেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন– যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ধার দেয়, সেই মেয়াদ পর্যন্ত প্রত্যহ খয়রাতের সওয়াব পাবে। মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি আরও সময় দেয়, তবে প্রত্যহ কর্জের সমান খয়রাত করার সওয়াব পাবে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু অনুয়ায়ী কোন কোন বুযুর্গ ভাল মনে করতেন না যে, ঋণী তাদের ঋণ পরিশোধ করে দিক। কেননা, কর্জ যতদিন অপরিশোধিত থাকবে, ততদিন কর্জদাতা প্রত্যহ সেই পরিমাণ টাকা খয়রাত করার সমান সওয়াব পেতে থাকবে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, হুযুর (সাঃ) বলেছেন, আমি জান্নাতের দরজায় লিখিত দেখেছি– সদকার সওয়াব দশ গুণ এবং কর্জের সওয়াব আঠার গুণ। কেউ কেউ এর কারণ এই বর্ণনা করেছেন, সদকা অভাবগ্রস্ত এবং অভাবহীন সবার হাতেই পড়ে, কিন্তু কর্জ চাওয়ার জিল্লতী অভাবী ছাড়া অন্য কেউ বরদাশত করে না। যে ব্যক্তি কোন বস্তু বিক্রয় করে ক্রেতার কাছ থেকে তার মূল্য তখনই নেয় না এবং তাগাদাও করে না, সে-ও কর্জদাতার অনুরূপ। কথিত আছে, হযরত হাসান বসরী একটি খচ্চর চারশ' দেরহামে বিক্রি করলেন। মূল্য দেয়ার সময় ক্রেতা বলল ঃ আবু সায়ীদ, কিছু রেয়াত করুন। তিনি বললেন, যাও, আমি তোমাকে একশ' দেরহাম ছেড়ে দিলাম। সে বলল ঃ এখন আপনি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। তিনি বললেন ঃ আরও একশ' দেরহাম মাফ করলাম। অতঃপর তিনি ক্রেতার

কাছ থেকে অবশিষ্ট মাত্র দু'শ দেরহাম নিলেন। কেউ আরজ করল ঃ এতে তো অর্ধেক মূল্য রয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ অনুগ্রহ হলে এরূপই হওয়া উচিত।

চতুর্থ, কর্জ শোধ করার ব্যাপারে অনুগ্রহ প্রদর্শনের উপায় হল, কর্জের টাকা এমনভাবে কর্জদাতার কাছে পৌঁছে দেয়া যাতে তার তাগাদা করার কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। সেমতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ خيركم احسنكم قضاء অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি যে উত্তমরূপে শোধ দেয়। কর্জ শোধ করার সামর্থ্য হয়ে গেলে দ্রুত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে এবং যেভাবে দেয়া শর্ত, তার চেয়ে উত্তম উপায়ে শোধ করে দেয়া উচিত। কর্জ শোধ করতে অক্ষম হলে এ নিয়তই রাখবে, যখন হাতে টাকা আসবে তখনই শোধ করে দেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এই নিয়তে কর্জ গ্রহণ করে যে, হাতে আসামাত্রই দিয়ে দেবে, আল্লাহ তাআলা তার উপর ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন যাতে তার হেফাযত করে এবং কর্জ শোধ করা পর্যন্ত তার জন্যে দোয়া করে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু অবগত হয়ে পূর্ববর্তী কয়েকজন বুযুর্গ প্রয়োজন ছাড়াও কর্জ গ্রহণ করতেন। কোন কর্জদাতা কঠোর ভাষায় কথা বললে তা বরদাশত করা এবং তার সাথে নরম ব্যবহার করা উচিত। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণ হবে। বর্ণিত আছে, একবার জনৈক কর্জদাতা মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এল এবং কর্জ শোধ না করা পর্যন্ত সে তাঁর সাথে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় কথা বলল। সাহাবায়ে কেরাম তাকে সাবধান করতে চাইলে তিনি বললেন ঃ যেতে দাও, হকদার বলেই সে এমন করেছে। কর্জদাতা ও কর্জ গ্রহীতার মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হলে তৃতীয় ব্যক্তির উচিত কর্জদাতার পক্ষপাতিত্ব না করা। কারণ, কর্জদাতা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা থেকে কর্জ দেয়, আর কর্জ গ্রহীতা নিজের অভাবের তাড়নায় কর্জ গ্রহণ করে, তাই অভাবগ্রস্তের রেয়াত করাই সমীচীন। হাঁ, যখন কর্জগ্রহীতা সীমালঙ্ঘন করে তখন তার সাহায্য এভাবে করা উচিত, যাতে সে সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ নিজের ভাইয়ের সাহায্য কর, সে জালেম হোক অথবা মজলুম। কেউ আরজ করল ঃ জালেম হলে তার সাহায্য কিভাবে করব? তিনি বললেন ঃ জুলুম থেকে বিরত রাখাই তার সাহায্য।

পঞ্চম, কোন ক্রেতা পণ্যদ্রব্য ফেরত দিতে চাইলে তা অনুমোদন করবে। কেননা, ফেরত সে-ই দেবে, যে ক্রয়-বিক্রয়ে অনুতপ্ত হবে এবং নিজের জন্যে তাকে ক্ষতিকর মনে করবে। সুতরাং নিজের জন্যে এমন বিষয় পছন্দ করা উচিত নয়, যা তার ভাইয়ের জন্যে ক্ষতির কারণ হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে অনুতপ্ত ব্যক্তির লেনদেন ফেরত দেবে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার ক্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন।

ষষ্ঠ, বাকী দিলে ফকীর ও নিঃস্বদেরকে দেবে এবং লেনদেনের সময় নিয়ত করবে যে, সামর্থ্য না হলে তাদের কাছে দাবী করব না। সেমতে পূর্ববর্তী সাধু ব্যবসায়ীদের কাছে দুটি হিসাব বহি থাকত। একটির শিরোনাম কিছুই হত না। তাতে অজ্ঞাত, দুর্বল ও নিঃস্বদের নাম লেখা থাকত। কোন ফকীর তাদের দোকানে এসে যদি বলত, আমার অমুক খাদ্য শস্য ও ফলের প্রয়োজন; কিন্তু আমার হাতে দাম নেই, তবে বুযুর্গ ব্যবসায়ী বলতেন ঃ নিয়ে যাও। যখন তোমার হাতে দাম হয় তখন দিয়ে যেয়ো। এর পর তিনি তার নাম সেই হিসাব বহিতে লেখে রাখতেন। পূর্ববর্তী বুযুর্গণ এরূপ ব্যবসায়ীকেও সাধু মনে করতেন না; বরং তাকেই সাধু গণ্য করতেন, যে ফকীরের নামই খাতায় লেখত না এবং তার যিম্মায় কোন কর্জ রাখত না; বরং ফকীরকে বলে দিত, যতটুকু প্রয়োজন নিয়ে যাও। তোমার কাছে দাম হলে দিয়ে যাবে। নতুবা এটা তোমার জন্যে হালাল করে দেয়া হল।

মোট কথা, এগুলো ছিল পূর্ববর্তী ভাল মানুষদের ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়মনীতি। এগুলো সব বর্তমানে মিটে গেছে। এখন কেউ এ সব নিয়মনীতির উপর কায়েম থাকলে সে যেন এই পন্থাকে পুনরুজ্জীবিত করবে। প্রকাশ থাকে যে, ব্যবসা-বাণিজ্য মানুষের জন্যে একটি কষ্টিপাথর, যদ্দ্বারা তাদের দ্বীনদারী ও তাকওয়া পরীক্ষা করা হয়। এজন্যেই বলা হয়, যখন কোন ব্যক্তির প্রতিবেশী তার গুণ-কীর্তন করে, সফরে গেলে সফরসঙ্গী তার প্রশংসা করে এবং বাজারে লেনদেনকারীরা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং তাকে ভাল বলে, তখন সে ব্যক্তির সাধুতায় কোন সন্দেহ করা উচিত নয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্যবসায়ীদের জন্যে জরুরী দিকনির্দেশনা

ব্যবসায়ীর উচিত ধর্মের ভয় রাখা অর্থাৎ, প্রত্যেক কাজে ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখা; জীবিকার ধান্ধায় পড়ে পরকাল থেকে গাফেল হয়ে জীবন বরবাদ করা উচিত নয়। পরকালের লোকসান জাগতিক মুনাফা দ্বারা পূরণ হতে পারে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত পুঁজি বাঁচিয়ে রাখা। মানুষের পুঁজি হচ্ছে তার ধর্ম। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) তাঁর ওসিয়তে বলেন, দুনিয়াতে তোমার কোন অংশ জরুরী, কিন্তু তোমার আখেরাতের অংশের প্রয়োজন অধিক। অতএব এখান থেকেই শুরু কর এবং প্রথমে আখেরাতের অংশ গ্রহণ কর। দুনিয়ার অংশ এমনিতেই আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا অর্থাৎ, দুনিয়া থেকে তুমি তোমার আখেরাতের অংশ ভুলে যেয়ো না। দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। পুণ্য এখান থেকেই অর্জিত হয়।

জানা উচিত, ধর্মের প্রতি ব্যবসায়ীর খেয়াল সাতটি বিষয় দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। প্রথম, ব্যবসায়ের শুরুতে নিয়ত ও বিশ্বাস সঠিক রাখতে হবে। এই নিয়তে ব্যবসা করবে যে, জীবিকার জন্যে সওয়াল করতে না হয় এবং অপরের মুখাপেক্ষী না হতে হয়; বরং হালাল উপার্জনলব্ধ ধনসম্পদ দ্বারা ধর্মকর্মে সাহায্য নেয়া এবং পরিবার-পরিজনের হক আদায় করা লক্ষ্য হতে হবে। এভাবে ব্যবসায়ী ব্যক্তি অর্থ দ্বারা জেহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সকল মুসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষার নিয়ত করবে এবং অপরের জন্যে তাই পছন্দ করবে যা নিজের জন্যে পছন্দ করা হয়। লেনদেনে ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের পন্থা অনুসরণের নিয়ত করবে, যেভাবে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আরও নিয়ত করবে যে, বাজারে ভালমন্দ যা দেখবে, তাতে সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ সম্পর্কিত নীতি পালনে কোনরূপ ক্রুটি করবে না। অন্তরে এসব নিয়ত ও আকীদা পোষণ করলে ব্যবসায়ী আখেরাতের একজন পথিক হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় কিছু ধনসম্পদ পাওয়া গেলে তা হবে মুনাফা। আর যদি দুনিয়ার কিছু লোকসান হয়, তবে আখেরাতে ফায়দা লাভ করবে।

দ্বিতীয়, ফরযে কেফায়া পালন করার উদ্দেশে ব্যবসায়ে অথবা শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করবে। কেননা, শিল্পকর্ম অথবা ব্যবসা সম্পূর্ণ বর্জিত হলে জীবিকার কারখানা অচল হয়ে পড়বে এবং অধিকাংশ মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ, সকলের ব্যবস্থাপনাই সকলের পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতায় সম্পন্ন হচ্ছে। এক এক দল মানুষ এক এক কাজের যিম্মাদার। যদি সকল মানুষ একই শিল্পকর্ম করতে শুরু করে এবং অন্য সকল শিল্প বর্জিত হয়, তবে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। "আমার উম্মতের মতবিরোধ রহমত"– কেউ কেউ এই হাদীসকে এই অর্থে নিয়েছেন যে, মতবিরোধের উদ্দেশ্য এখানে আলাদা আলাদা শিল্পকর্ম ও পেশা। শিল্পকর্মসমূহের মধ্যে কিছু অত্যন্ত উপকারী এবং কিছু অনাবশ্যক। কারণ, এগুলো দ্বারা পরিণামে আরামপ্রিয়তা, বিলাসিতা ও জাগতিক সাজসজ্জা হয়ে থাকে। অতএব এমন শিল্পকর্ম অবলম্বন করা উচিত, যাদ্বারা মুসলমানদের উপকার হয় এবং যা ধর্ম-কর্মে আবশ্যক। পক্ষান্তরে বাহ্যিক সাজ-সজ্জায় শিল্প থেকে দূরে থাকতে হবে; যেমন কারুকার্য করা, স্বর্ণের কাজ করা, চুনার আস্তর করা ইত্যাদি। এ ধরনের কাজকে ধর্মপরায়ণতা মাকরূহ মনে করে। ক্রীড়া-কৌতুকের সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করা হারাম। এগুলো নির্মাণ থেকে বেঁচে থাকা জুলুম পরিহারের মধ্যে শামিল। এমনিভাবে পুরুষের জন্যে রেশমী জামা সেলাই করা এবং পুরুষের সোনার আংটি গড়া পাপ, এ মজুরি হারাম।

তৃতীয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে দুনিয়ার বাজার যেন ব্যবসায়ীকে আখেরাতের বাজার থেকে বিমুখ না করে। আল্লাহর মসজিদসমূহ হচ্ছে আখেরাতের বাজার। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলেন ঃ

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۤءِ الزَّكٰوةِ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন কোন গৃহকে উঁচু করার এবং তাতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার নির্দেশ করেছেন। সেখানে এমন লোকেরা সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর যিকির, নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান থেকে গাফেল করে না।

অতএব বাজারের সময় হওয়া পর্যন্ত দিনের প্রথম অংশকে আখেরাতের জন্যে নির্দিষ্ট করবে; অর্থাৎ, তখন মসজিদে বসে ওযিফা ইত্যাদি পাঠ করবে। হযরত ওমর (রাঃ) ব্যবসায়ীদেরকে বলতেন ঃ দিনের শুরুকে আখেরাতের জন্যে নির্ধারিত কর এবং এর পরবর্তী সময়কে দুনিয়ার জন্যে রেখে দাও। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ তাই করতেন। এক হাদীসে আছে, রাত ও দিনের ফেরেশতারা ফজর ও আসরের সময় আল্লাহ তাআলার দরবারে সমবেত হয়। তখন সবকিছু জানা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? ফেরেশতারা বলে ঃ আমরা তাদেরকে নামায পড়ার অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখনও নামায পড়া অবস্থায় পেয়েছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি– আমি তাদেরকে ক্ষমা করলাম। এর পর ব্যবসায়ী যখন দিনের মধ্যভাগে যোহর কিংবা আসরের আযান শুনবে, তখন অন্য কোন কাজের আগ্রহ না করে সোজা মসজিদের দিকে রওয়ানা হবে। তখন কোন কাজ থাকলে তা পরিত্যাগ করবে। কেননা, জামাতে ইমামের সাথে প্রথম তকবীর না পাওয়া এতবড় ক্ষতি, যা পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সবকিছু দিয়ে পূরণ করা যাবে না। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের নিয়ম ছিল, তাঁরা আযান হওয়ার সাথে সাথে দোকানে বালক ও যিম্মীদেরকে রেখে মসজিদে চলে যেতেন। তাঁরা নামাযের সময় দোকানের হেফাযত করার জন্যে এই বালক ও যিম্মীদেরকে কিছু মজুরি দিতেন। এভাবেই তাদের জীবিকা নির্বাহ হত।

চতুর্থ, এতটুকুতেই ক্ষান্ত হবে না; বরং বাজারে থাকার সময় সর্বদা আল্লাহ পাককে স্মরণ করবে এবং তসবীহে মশগুল থাকবে। কেননা, বাজারে গাফেলদের মধ্য আল্লাহর স্মরণে অনেক ফযীলত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ গাফেলদের ভেতরে থেকে আল্লাহর যিকিরকারী এমন, যেমন পলাতকদের মধ্যে জেহাদকারী অথবা মৃতদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তি। এক রেওয়ায়েতে আছে, শুষ্ক ঘাসের মধ্যে সবুজ সতেজ বৃক্ষ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি বাজারে এসে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে, তার জন্যে লক্ষ পুণ্যের সওয়াব লেখা হবে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ

وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তাঁর শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দেন। তিনি চিরজীবী– অমর। কল্যাণ তাঁরই হাতে, তিনি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান।

হযরত ইবনে ওমর, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে ও অন্য কয়েকজন মনীষী কেবল এই দোয়ার ফযীলত হাসিল করার জন্যে বাজারে যেতেন।

পঞ্চম, বাজার ও ব্যবসায়ের প্রতি এত মোহ পোষণ না করবে যাতে সবার আগে বাজারে যেতে হয় এবং সময় শেষে ফিরতে হয়। অথবা ব্যবসায়ের খাতিরে সমুদ্রে সফর করবে না, এটা মাকরূহ। বলা হয়, যে ব্যক্তি সমুদ্রের সফর করে সে রিযিক অন্বেষণে সীমা ছাড়িয়ে যায়। এক হাদীসে আছে, তিন কাজ– হজ্জ, ওমরা ও জেহাদ ছাড়া অন্য কাজের জন্যে সামুদ্রিক সফর করবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ বলতেন ঃ বাজারে প্রথমে প্রবেশ করো না এবং শেষে বের হয়ো না। কারণ, এরূপ করলে শয়তান ডিম-বাচ্চা দেয়। এক হাদীসে আছে– সর্বনিকৃষ্ট স্থান হচ্ছে বাজার এবং বাজারীদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট সে ব্যক্তি, যে সবার আগে বাজারে প্রবেশ করে এবং সবার শেষে বাজার থেকে বের হয়। এই নিবৃত্তি তখন পূর্ণাঙ্গ হবে, যখন মানুষ জীবিকার একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেয়। যে পরিমাণ অর্জিত হয়ে গেলে সে বাজার থেকে চলে আসবে এবং আখেরাতের ব্যবসায়ে মশগুল হবে। পূর্ববর্তী মনীষীদের নিয়ম এমনি ছিল। তাঁদের কেউ কেউ তিন পয়সা পেয়ে গেলেই বাজার থেকে চলে আসতেন এবং এতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। হাম্মাদ ইবনে সালমা রেশমী বস্ত্রের ঝোলা বিক্রয়ের জন্যে সামনে রেখে দিতেন। প্রায় ছয় আনা অর্জিত হয়ে গেলে তিনি ঝোলা তুলে নিয়ে বাড়ী চলে আসতেন।

ষষ্ঠ, কেবল হারাম থেকে আত্মরক্ষা করেই ক্ষান্ত থাকবে না; বরং সন্দেহের স্থান, সন্দেহজনক বিষয়াদি থেকেও বেঁচে থাকবে। এ ব্যাপারে ফতোয়া কি বলে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। নিজের মনের কাছে ফতোয়া চাইবে। মনে কোন রকম খট্‌কা অনুভব করলে তা থেকে বেঁচে থাকবে। কোন সন্দেহযুক্ত বস্তু সামনে এলে তার অবস্থা লোকের কাছে

জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে। অন্যথায় সন্দেহযুক্ত মাল খাওয়া হবে। একবার এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে দুধ উপস্থিত করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই দুধ কোথায় পেলে? লোকটি আরজ করল ঃ ছাগলের স্তন থেকে লাভ করেছি। তিনি বললেন ঃ ছাগল কোত্থেকে এল? লোকটি বলল ঃ অমুক জায়গা থেকে। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুধ পান করলেন এবং বললেন ঃ আমাদের পয়গম্বর সম্প্রদায়ের প্রতি নির্দেশ রয়েছে, উৎকৃষ্ট মাল ছাড়া খেতে পারব না এবং সৎকাজ ছাড়া কিছু করতে পারব না। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকেও তাই নির্দেশ করেছেন, যা পয়গম্বরগণকে করেছেন। সেমতে বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ـ

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা আমার দেয়া পবিত্র বস্তুসমূহ খাবে।

আর রসূলগণকে বলেছেন–

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ـ

অর্থাৎ, হে রসূলগণ, পবিত্র বস্তু থেকে খান এবং সৎকর্ম সম্পাদন করুন।

মোট কথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই দুধের মূল এবং মূলের মূল পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেছেন। এর বেশী জিজ্ঞেস করেননি। কেননা, এর বেশীতে জটিলতা রয়েছে। আমরা সত্বরই হালাল ও হারাম অধ্যায়ে লেখব যে, এই প্রশ্ন করা কোথায় ওয়াজিব হয়। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর খেদমতে পেশকৃত প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে এই প্রশ্ন করতেন না। এতে বুঝা যায়, সর্বত্র এই প্রশ্ন করা জরুরী নয়। যার সাথে লেনদেন করবে সে জালেম, চোর, খেয়ানতকারী অথবা সুদখোর কিনা দেখে লেনদেন করবে। এরূপ হলে তার সাথে লেনদেন করবে না। কেননা, এরূপ ব্যক্তির সাথে লেনদেন করলে তার কুকর্মে সাহায্য করা হবে।

সারকথা, এখন যমানা খুব নাজুক। তাই ব্যবসায়ীর উচিত মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করে নেয়া। এক ভাগের সাথে লেনদেন করবে এবং এক ভাগের সাথে করবে না। যাদের সাথে লেনদেন করবে, তারা তুলনামূলকভাবে কম হওয়া হওয়া উচিত। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ এক ছিল সত্য যুগ। তখন মানুষ যদি বাজারে গিয়ে জিজ্ঞেস করত, কার সাথে লেনদেন করব? তখন উত্তর পেত, যার সাথে ইচ্ছা লেনদেন কর। এর পর এমন যুগ এল যখন উত্তরে বলা হত, যার সাথে ইচ্ছা লেনদেন কর; কিন্তু

অমুক অমুকের সাথে করো না। এর পর আর এক যুগ এল, যখন বলা হত, কারও সাথে লেনদেন করো না, কিন্তু অমুক অমুকের সাথে কর। এখন আমার ভয় হচ্ছে, ভবিষ্যতে এমনও থাকবে না। বলাবাহুল্য, এই বুযুর্গ যা আশংকা করতেন, এখন তা বিদ্যমান রয়েছে।

সপ্তম, প্রত্যেক লেনদেনকারীর সাথে নিজের যাবতীয় অবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। কেননা, কেয়ামতের দিন যাবতীয় কথা ও কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বলা হয়, কেয়ামতে ব্যবসায়ীকে এমন সবার সাথে দাঁড় করানো হবে, যাদের সাথে সে লেনদেন করেছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি এক ব্যবসায়ীকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা তোমার সাথে কি ব্যবহার করেছেন? সে বলল ঃ আমার সামনে পঞ্চাশ হাজার আমলনামা খুলে দিয়েছেন। আমি আরজ করলাম, এই সবগুলো গুনাহ্? এরশাদ হল– এগুলো তোমার লেনদেন। যাদের সাথে লেনদেন করেছ তাদের প্রত্যেকের আমলনামা আলাদা আলাদা এবং এতে আদ্যোপান্ত তোমার ও তাদের লেনদেন লিখিত রয়েছে। এ পর্যন্ত ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের বিষয় বর্ণিত হল। সুতরাং যে ব্যবসায়ী কেবল ন্যায়বিচার করে ক্ষান্ত থাকবে, সে সৎলোকদের মধ্যে গণ্য হবে। আর যে ন্যায়বিচারের সাথে অনুগ্রহও প্রদর্শন করবে, সে নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি কেউ এই উভয়টির সাথে ধর্মীয় ওযিফাসমূহ– যা পাঁচটি পরিচ্ছেদে লিখিত হয়েছে, পালন করে যায়, তবে সে সিদ্দীকগণের মধ্যে গণ্য হবে।
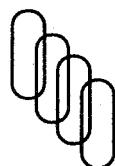
দ্বাদশ অধ্যায়

হালাল ও হারাম

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

طلب الحلال فريضة على كل مسلم অর্থাৎ, হালাল উপার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, কিন্তু এ ফরযটি বুঝা অন্যান্য ফরযের তুলনায় বিবেকের জন্যে যেমন কঠিন, তেমনি এটা পালন করা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর অত্যন্ত কঠিন। ফলে এ ফরযের জ্ঞান ও আমল উভয়টিই অধিকাংশ লোক প্রায় ভুলতে বসেছে। এ জ্ঞান সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে আমল আরও বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কারণ, মূর্খেরা মনে করে নিয়েছে, হালাল দুনিয়া থেকে পুরাপুরি বিদায় নিয়েছে এবং হালাল পর্যন্ত পৌঁছার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে গেছে। এখন পবিত্র বলতে নদীর পানি এবং কারও মালিকানাধীন নয় এমন যমীনের উদ্ভিদ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এ দু'টি ছাড়া আর যত মাল আছে, তাতে লেনদেনের অনিয়মের কারণে কলুষতা এসে গেছে। যেহেতু পানি ও ঘাস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা কঠিন, তাই হারামের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে? এ ধারণার বশবর্তী হয়ে মূর্খেরা দ্বীনের এ ফরযটি পেছনে নিক্ষেপ করেছে এবং মাল ও ধন-সম্পদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের কাজটি বর্জন করে বসেছে। অথচ বাস্তব অবস্থা এরূপ নয়। যা হালাল তা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট, হারামও প্রকাশ্য এবং আলাদা। এতদুভয়ের মাঝখানে রয়েছে সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহ। তবে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে এ তিনটি বিষয় একে অপরের সাথে মিলিত থাকে। যেহেতু এই সর্বশেষ বেদআতের ক্ষতি ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক হয়ে পড়েছে এবং এটা দাবানলের মত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই এটা দূর করার প্রচেষ্টা চালানো নেহায়েত জরুরী এবং হালাল হারাম ও সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহের পারস্পরিক পার্থক্য ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। নিম্নে আমরা সাতটি পরিচ্ছেদে এ বিষয়বস্তু বর্ণনা করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হালালের ফযীলত ও হারামের নিন্দা

এ সম্পর্কে কোরআন পাকের কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপ ঃ

كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا অর্থাৎ, তোমরা খাও পবিত্র বস্তু এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। এ আয়াতে আমল করার পূর্বে পবিত্র বস্তু খাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে, এখানে পবিত্র বস্তু বলে হালাল সামগ্রী বুঝানো হয়েছে।

لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ অর্থাৎ, তোমরা একে অপরের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। এখানে অন্যায়ভাবে খাওয়া অর্থে হারাম ভক্ষণ বোঝানো হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ـ

অর্থাৎ, যারা এতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছু ভরে না।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং যে সুদ অবশিষ্ট রয়েছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমানদার হও।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ـ

অর্থাৎ, যদি তোমরা তা না কর, তবে আল্লাহ ও রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে তৈরী হয়ে যাও।

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ অর্থাৎ, যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা পাবে তোমাদের মূলধন।

مَنْ عَادَ فَاُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ অর্থাৎ, যে আবার সুদ নেবে সেই হবে দোযখী।

প্রথমে সুদ খাওয়া আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার শামিল এবং পরিণামে জাহান্নামে প্রবেশের কারণ বলা হয়েছে। হালাল ও হারাম সম্পর্কে এছাড়া আরও অনেক আয়াত রয়েছে। এখন এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে। হযরত ইবনে মসউদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হালাল অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। কোন কোন আলেমের মতে এখানে জ্ঞানের অর্থ হালাল ও হারামের জ্ঞান এবং উভয় হাদীসের উদ্দেশ্যই এক। রসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনকে হালাল সামগ্রী উপার্জন করে খাওয়ায়, সে যেন আল্লাহ তাআলার পথে জেহাদ করে। আর যে সাধুতা সহকারে হালাল অর্জন করে, সে শহীদগণের স্তরে থাকবে। আরও বলা হয়েছে ঃ

من اكل الحلال اربعين يوما نور الله قلبه واجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ـ

যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন হালাল খাদ্য আহার করে, আল্লাহ তার অন্তর আলোকিত করেন এবং তার অন্তর থেকে প্রজ্ঞার ঝরণা তার মুখে প্রবাহিত করেন।

বর্ণিত আছে, হযরত সা'দ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আবেদন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার জন্যে দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ তাআলা আমার দোয়া কবুল করেন। তিনি বললেন ঃ اطيب طعمتك تستجب دعوتك অর্থাৎ, তোমার খাদ্য পবিত্র ও হালাল কর, তা হলেই তোমার দোয়া কবুল হবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার দুনিয়ালোভীদের আলোচনা করার পর বললেন ঃ অনেক বিক্ষিপ্ত মলিন মুখ ও ধূলি ধূসরিত ব্যক্তি রয়েছে, যাদের পানাহার হারাম, উপার্জন হারাম এবং হারাম দ্বারা লালিত পালিত, তারা হাত তুলে বলে ঃ হে পালনকর্তা, হে পালনকর্তা! তাদের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে? হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার এক ফেরেশতা প্রত্যেক রাতে বায়তুল মোকাদ্দাসে ঘোষণা করে– যে ব্যক্তি হারাম খায়, তার ফরয, নফল কিছুই কবুল হবে না। তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি একটি কাপড় দশ দেরহাম দিয়ে ক্রয় করে এবং তার ভেতরে এক দেরহাম হারাম থাকে, তার দেহে যে পর্যন্ত সে কাপড় থাকবে আল্লাহ তাআলা তার নামায কবুল করবেন না। আরও বলেন ঃ হারাম

থেকে উৎপন্ন মাংসের জন্যে দোযখই অধিক উপযুক্ত। আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোথা থেকে সম্পদ উপার্জন করে, তার পরওয়া করে না, আল্লাহ তাআলা তাকে কোন্ পথ দিয়ে জাহান্নামে ঢোকাবেন, তারও পরওয়া করবেন না। আরও বলা হয়েছে–

যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন করতে করতে সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে যায়, তার রাত এমনভাবে অতিবাহিত হবে যে, তার গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং ভোরে যখন সে উঠবে, তখন আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। আরও বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি গোনাহের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি করে তা খয়রাত করবে অথবা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে, আল্লাহ তাআলা তার যাবতীয় ব্যয়কে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এক হাদীসে আছে– সুদের এক দেরহাম আল্লাহ তাআলার কাছে মুসলমান অবস্থায় ত্রিশটি যিনার চেয়ে গুরুতর। আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে– পাকস্থলী দেহের চৌবাচ্চা। শিরা-উপশিরা তৃষ্ণার্ত হলে এই চৌবাচ্চার দিকে যায়। পাকস্থলী সুস্থ হলে শিরাগুলোও সুস্থতা সহকারে পানি পান করে ফিরে আসে। আর পাকস্থলী অসুস্থ হলে শিরাসমূহ অসুস্থ হয়ে ফিরে। দ্বীনদারীর জন্যে খাদ্য যেমন, ইমারতের জন্যে ভিত্তি তেমনি। ভিত্তি মজবুত ও সোজা স্থাপিত হলে ইমারত সোজা ও উঁচু হবে। পক্ষান্তরে ভিত্তি বাঁকা এবং দুর্বল হলে ইমারত ভূমিসাৎ হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের উক্তি রয়েছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার নিজের গোলামের উপার্জিত দুধ পান করেছিলেন। এর পর গোলামকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমি এক সম্প্রদায়ের জন্যে ভবিষ্যত গণনা করেছিলাম, তারা আমাকে এই দুধ দিয়েছিল। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) গলায় অঙ্গুলি ঢুকিয়ে বমি করতে শুরু করলেন। এমন কি গোলামের ধারণা হল তাঁর দম বের হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ ইলাহী, আমি সেই দুধের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী, যা আমার শিরা উপশিরায় মিশে গেছে। অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রাঃ) একবার যাকাতের উটের দুধ পান করে ফেলেন। পরে জানতে পেরে গলায় অঙ্গুলি ঢুকিয়ে বমি করে দেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা শ্রেষ্ঠ এবাদত থেকে গাফেল, যার নাম হারাম থেকে বেঁচে থাকা। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যদি তোমরা নামায পড়তে পড়তে ধনুকের মত বাঁকা এবং রোযা রাখতে রাখতে লাকড়ির মত কৃশ

হয়ে যাও, তবুও আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এসব আমল কবুল করবেন না, যে পর্যন্ত হারাম থেকে বেঁচে না থাক। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন ঃ যে যা পেয়েছে তা এভাবেই পেয়েছে যে, পেটে যা ফেলেছে ভেবে চিন্তে ফেলেছে। হযরত ফোযায়ল বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার আহার্য বুঝে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার নাম সিদ্দীকগণের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে দেন। অতএব হে মিসকীন, যখন তুমি রোযার ইফতার কর, তখন দেখে নাও কার কাছে ইফতার করছ। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি যমযমের পানি পান করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমার নিজের বালতি থাকলে পান করতাম। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে হারাম মাল ব্যয় করে, সে সেই ব্যক্তির মত, যে নিজের বস্ত্র পেশাব দ্বারা পবিত্র করে। অথচ পাক পানি ছাড়া বস্ত্র পাক হয় না। তেমনি হালাল মাল ছাড়া অন্য কিছু গোনাহ দূর করে না। হযরত সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন সন্দিগ্ধ বস্তু ভক্ষণ করে, তার অন্তর কাল হয়ে যায়। কোরআনের আয়াত– كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ এর অর্থও তাই। একবার ফোযায়ল ইবনে আয়ায, ইবনে ওয়ায়না ও ইবনে মোবারক (রহঃ) মক্কা মোয়াযযমায় ওহায়ব ইবনে ওবায়েদ (রহঃ)-এর কাছে সমবেত হন এবং খোরমার কথা আলোচনা করেন। ওহায়ব বললেন ঃ খোরমা আমার খুব প্রিয়, কিন্তু আমি তা খাই না। কেননা, মক্কার খেজুর বাগানগুলি যুবায়দা প্রমুখের বাগানের সাথে মিশে গেছে। একথা শুনে ইবনে মোবারক বললেন ঃ যদি আপনি এত চুলচেরা দেখেন, তবে রুটি খাওয়াও কঠিন হয়ে পড়বে। ওহায়ব কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ গম উৎপাদনের ভূখন্ড আশেপাশের ভূখন্ডের সাথে মিশে গেছে। একথা শুনতেই ওহায়ব বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। সুফিয়ান সওরী ইবনে মোবারককে বললেন ঃ তুমি এ লোকটিকে মেরে ফেলেছ। তিনি বললেন ঃ আমার উদ্দেশ্য ছিল তিনি যেন এই চুলচেরা বিশ্লেষণ ছেড়ে দেন। ওহায়বের জ্ঞান ফিরে এলে তিনি সারাজীবন রুটি খাবেন না বলে কসম খেলেন। এর পর তিনি ক্ষুধা লাগলে দুধ পান করে নিতেন। একবার তাঁর জননী দুধ আনলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই দুধ কোথাকার? মা বললেন ঃ অমুক ব্যক্তির ছাগলের দুধ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ছাগলটি তার কাছে কোত্থেকে এল এবং মূল্য কোথা থেকে

দিল? মা এসব কথা বলে দেয়ার পর তিনি দুধের পাত্রটি মুখের কাছে নিলেন, কিন্তু বললেন ঃ আরেকটি কথা রয়ে গেছে। এই বকরী কোথায় ঘাস খেত? মা চুপ হয়ে গেলেন। তিনিও দুধ পান করলেন না। কারণ ছাগলটি এমন জায়গায় ঘাস খেত, যেখানে মুসলমানদের কিছু হক ছিল। স্নেহময়ী জননী বললেন ঃ পান করে নাও। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর নাফরমানী করে আল্লাহর কাছে মাগফেরাত চাইব- এটা আমার কাছে ভাল মনে হয় না। অর্থাৎ, পান করলে তাঁর নাফরমানী যেখানে নিশ্চিত, সেখানে ইচ্ছা করে নাফরমানী করার পর ক্ষমা চাওয়া ঠিক নয়। মোট কথা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ সন্দিগ্ধ বস্তু থেকে এভাবেই গা বাঁচিয়ে চলতেন।

হালাল ও হারামের প্রকারভেদ ঃ প্রকাশ থাকে যে, হালাল ও হারামের বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহর কিতাবসমূহে বর্ণিত রয়েছে। সত্যান্বেষী ব্যক্তি যদি তার খাদ্য তালিকা ফতোয়ার দৃষ্টিতে হালাল বস্তু দ্বারা তৈরী করে এবং এ ছাড়া অন্য কিছু না খায়, তবে তার জন্যে এই দীর্ঘ আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু যে ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন পন্থায় খাদ্য সংগ্রহ করে, তার হালাল-হারাম বিশদভাবে জানা প্রয়োজন। এই বিশদ বিবরণ আমি ফেকাহ গ্রন্থের সাহায্যেই লিপিবদ্ধ করেছি। এখানে সংক্ষেপে হালাল সম্পদ অর্জনের উপায়সমূহ বর্ণনা করব।

সম্পদ দু'প্রকার- সত্তাগত হারাম অথবা অর্জনে ক্রুটির কারণে হারাম। প্রথম প্রকার যেমন মদ, শূকর ইত্যাদি। এর বিবরণ হচ্ছে, পৃথিবীতে খাদ্য জাতীয় বস্তু তিন প্রকার ঃ (১) খনিজ পদার্থ, যেমন, লবণ, মাটি ইত্যাদি, (২) উদ্ভিদ জাতীয় এবং (৩) প্রাণী জাতীয়। খনি থেকে নির্গত বস্তুসমূহ ক্ষতিকর বিধায় হারাম। কোন কোন বস্তু বিষতুল্য। রুটি খাওয়া ক্ষতিকর হলে তা-ও হারাম হত। মাটি খাওয়াও ক্ষতির কারণেই হারাম। এ থেকে বুঝা গেল, খনিজ পদার্থের কোন অংশ শুরবা অথবা কোন তরল খাদ্যে পড়ে গেলে খাদ্য হারাম হবে না। উদ্ভিদের মধ্যে যেসব বস্তু বুদ্ধি নাশ করে; যেমন- ভাং, গাঁজা ইত্যাদি, অথবা জীবননাশ করে; যেমন- বিষবৃক্ষ অথবা স্বাস্থ্য বিনাশ করে, সেগুলো হারাম। মোট কথা, শরাব ও মাদক দ্রব্য ছাড়া অন্যগুলো কোন না কোন কারণে হারাম হয়, কিন্তু মাদক দ্রব্যের ক্ষেত্রে তা নয়। মাদক দ্রব্যের অল্প খেলেও হারাম, তাতে নেশা হোক বা না হোক। এর এক কারণ সত্তাগত নাপাকী এবং অন্য কারণ গুণগত অর্থাৎ, মাদকতা সৃষ্টিকারী উগ্রতা। বিষাক্ত বস্তু থেকে যদি ক্ষতির গুণ দূর হয়ে যায়- পরিমাণ হ্রাস করার কারণে অথবা অন্য বস্তু মিশ্রিত করার কারণে, তবে তা হারাম হবে না।

প্রাণী দু'প্রকার- খাদ্য ও অখাদ্য। এর বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহর খাদ্য অধ্যায়ে উদ্ধৃত রয়েছে। যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, সেগুলোও শরীয়তসম্মতভাবে যবেহ করা শর্ত। শিকার ও যবেহ অধ্যায়ে এসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যেসব প্রাণী শরীয়তসম্মতভাবে যবেহ করা হয় না অথবা মরে যায়, সেগুলো হারাম। তবে টিড্ডি ও মাছ হালাল। স্বভাবগত অপছন্দের কারণে মাছি, বিচ্ছু ইত্যাদি রক্তহীন প্রাণী মাকরূহ। মরার কারণে এগুলো নাপাক হয় না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ করেছেন, মাছি খাদ্যে পড়ে গেলে তা পুরোপুরি ডুবিয়ে ফেলে দাও। খাদ্য কোন সময় গরম থাকে, ফলে মাছি পড়ার সাথে সাথে মরে যায়। যদি কোন পিঁপড়া অথবা মাছি ব্যঞ্জনের পাত্রে রান্না হয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে সে পাত্রের সমস্ত ব্যঞ্জন ফেলে দেয়া জরুরী নয়।

যেসব প্রাণী খাওয়া হয়, শরীয়ত মত যবেহ করলেও সেগুলোর সকল অঙ্গ খাওয়া হালাল হয় না; বরং রক্ত, মল এবং যা যা নাপাক সব হারাম। দ্বিতীয়তঃ যে সম্পদ অর্জনে ক্রুটির কারণে হারাম হয় তার বর্ণনা সুবিস্তৃত। এ ধরনের সম্পদকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম, মালিকবিহীন মাল। যেমন- খনি থেকে কিছু বের করা, পতিত জমি আবাদ করা, অন্যের মালিকানায় শিকার করা, জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা, নদীর পানি নেয়া। এসব সামগ্রীতে কারও মালিকানার সম্পর্ক না থাকলে এগুলো হালাল এবং যে এগুলো সংগ্রহ করবে, সে মালিক হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়, যে বস্তু এমন লোকদের কাছ থেকে জবরদস্তি নেয়া হয়, যাদের কাছ থেকে নেয়াতে বাধা নেই। যেমন, যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত গনীমত সামগ্রী, অথবা যুদ্ধ ছাড়াই কাফেরদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মালে ফায়। এই মাল তখনও হালাল হয়, যখন এ থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করে হকদারদের মধ্যে ন্যায়ভাবে বণ্টন করা হয়।

তৃতীয়, যে বস্তু এমন লোকদের কাছ থেকে জবরদস্তি নেয়া হয়, যারা ওয়াজিব প্রাপ্য আদায় করে না এবং সম্মতি ছাড়াই নেয়ার যোগ্য হয়ে

যায়। এই সব বস্তুও কয়েকটি শর্তে হালাল; যখন হকদার হওয়ার কারণ পূর্ণ হয়, যখন ওয়াজিব পরিমাণেই নেয়া হয়, যখন বিচারক, বাদশাহ অথবা হকদার নেয়। এসব শর্ত পূর্ণ হলে যেসব বস্তু নেয়া হবে, তা হালাল।

চতুর্থ, যে মাল বিনিময়ের আকারে মালিকের সম্মতিক্রমে নেয়া হয়। এটা তখন হালাল হয়, যখন উভয় বিনিময়ের শর্তাবলী, ক্রেতা বিক্রেতা এবং প্রস্তাব ও গ্রহণের শর্তাবলী ঠিকভাবে পালন করা হয় এবং অন্যায় শর্তসমূহ থেকে আত্মরক্ষা করা হয়। এসব শর্ত ফেকাহর কিতাবুল বুয়ুতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চম, যে মাল মালিকের সম্মতিক্রমে বিনিময় ছাড়াই নেয়া হয়। এটা তখন হালাল হয়, যখন মাল, দাতা গ্রহীতা ও দানের শর্ত পূর্ণ করা হয় এবং কোন ওয়ারিসের ক্ষতি না হয়। হেবা, ওসিয়ত ও সদকা অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে।

ষষ্ঠ, যে মাল ইচ্ছা ছাড়াই মানুষ প্রাপ্ত হয়; যেমন, মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি। এটা তখন হালাল হয়, যখন মৃত ব্যক্তি হালাল উপায়ে সেই সম্পত্তি অর্জন করে। এছাড়া ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে প্রথমে তার কর্জ ও ওসিয়ত আদায় হয়ে যায়, ওয়ারিসদের অংশ ন্যায়ভাবে বণ্টন হয় এবং যাকাত, হজ্জ, কাফফারা ইত্যাদি ওয়াজিব হক আদায় হয়। ফেকাহর কিতাবুল ওসায়া ও কিতাবুল ফরায়েযে এর বিবরণ দেয়া হয়েছে।

মোট কথা, আমরা আমদানীর সবগুলো উপায়ের দিকে সংক্ষেপে ইশারা করলাম যাতে সত্যান্বেষী ব্যক্তি বুঝে নেয় যে, তার আমদানী বিভিন্ন উপায়ে হলে এসব বিষয় তাকে জেনে নিতে হবে। সে প্রয়োজনীয় বিধানসমূহ আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে। জিজ্ঞাসা না করে কিছু করবে না। কেননা, কেয়ামতের দিন যেমন আলেমকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি তোমার এলমের খেলাফ কেন করলে, তেমনি মূর্খকেও বলা হবে, তুমি তোমার মূর্খতা আঁকড়ে রইলে কেন, শিখে নিলে না কেন? তুমি কি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই এরশাদ জানতে না যে, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয!

হালাল ও হারামের স্তরভেদ ঃ প্রকাশ থাকে যে, যা হারাম তাই ভ্রষ্ট, কিন্তু কতক হারামের মধ্যে ভ্রষ্টতা বেশী এবং কতক হারামের মধ্যে

অল্প। অনুরূপভাবে যা হালাল তাই পাক সাফ, কিন্তু কোন কোন হালাল অধিক পাক এবং কতক অল্প। উদাহরণতঃ ডাক্তার বলে ঃ সকল মিষ্টি গরম, কিন্তু কতক মিষ্টি অধিক গরম যেমন, চিনি এবং কতক কম গরম, যেমন গুড়। আমরা এখানে হারাম থেকে বাঁচার চারটি স্তর উল্লেখ করেছি।

প্রথম, আদেল ব্যক্তির ওয়ারা তথা পরহেযগারী। এটা সেই হারাম থেকে বেঁচে থাকার নাম, যাতে লিপ্ত হলে মানুষ ফাসেক হয়ে যায় এবং আদেল থাকে না। এটা জাহান্নামে দাখিল হওয়ার কারণ। এই পরহেযগারী তখন অর্জিত হয়, যখন ফেকাহবিদরা যাকে হারাম বলেন তা থেকে আত্মরক্ষা করা হয়।

দ্বিতীয়, সালেহীন তথা সৎকর্মপরায়ণদের পরহেযগারী। এটা সন্দেহযুক্ত হারাম থেকে আত্মরক্ষার নাম।

তৃতীয়, মুত্তাকী তথা খোদাভীরুদের পরহেযগারী।এটা এমন বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নাম, যা ফতোয়াদৃষ্টে হারাম নয় এবং হালাল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ নেই, কিন্তু হারামের দিকে পৌঁছে দেয়ার আশংকা রয়েছে। অর্থাৎ,, যেসব বিষয়ে কোন ভয় নেই, সেগুলো ভয়ের বিষয়সমূহের কারণে বর্জন করা। হাদীসে বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

لايبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لاباس به مخافة ممابه باس -

অর্থাৎ, বান্দা মুত্তাকীর স্তরে পৌঁছতে পারে না, যে পর্যন্ত সে দোষমুক্ত বিষয়ের ভয়ে দোষহীন বিষয় বর্জন না করে।

চতুর্থ, সিদ্দীকগণের পরহেযগারী। এটা এমন বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নাম, যা দোষমুক্ত নয় এবং তদ্দ্বারা দোষমুক্ত বিষয় পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ারও আশংকা নেই, কিন্তু একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে করা হয় না অথবা যাতে তাঁর এবাদতে শক্তি অর্জনের নিয়ত থাকে না। সিদ্দীকগণ এরূপ বিষয় থেকে বেঁচে থাকতেন।

বর্ণিত প্রথম স্তরের হারামেরও কয়েকটি স্তর আছে। উদাহরণতঃ ফাসেদ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে কারও মাল নেয়া তেমন হারাম নয়; যেমন

হারাম কারও কাছ থেকে মাল ছিনিয়ে নেয়া। বরং ছিনিয়ে নেয়া মাল অধিক হারাম। এই পার্থক্য এভাবে জানা যায়, শরীয়ত যে সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয়ে কঠোরতা, শাস্তিবাণী উচ্চারণ ও তাকিদ বেশী করেছে, সেগুলো অবলম্বন করা অধিক গোনাহ এবং যেখানে কঠোরতা কম, সেখানে গোনাহ কম। তওবা অধ্যায়ে সগীরা ও কবীরা গোনাহের পার্থক্য প্রসঙ্গে বিষয়টি আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। অনুরূপভাবে যদি কোন বস্তু কোন ফকীর, সাধু অথবা এতীমের কাছ থেকে জবরদস্তি ছিনিয়ে নেয়া হয়, তা কোন সবল, ধনী অথবা ফাসেকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার তুলনায় অধিক ভ্রষ্টতাপূর্ণ। সুতরাং বিষয় থেকে গাফেল হওয়া উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে এ তত্ত্বটিও স্মর্তব্য, যদি গোনাহগারদের বিভিন্ন স্তর না থাকত তবে দোযখের স্তরও ভিন্ন ভিন্ন হত না।

দ্বিতীয় স্তরের হারামের উদাহরণ হচ্ছে সন্দিগ্ধ বিষয়সমূহ, যা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব। তবে কোন কোন সন্দিগ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকাও ওয়াজিব। এগুলো হারামের অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা মাকরূহ। এ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াসওয়াসা তথা শংকাশীলদের পরহেযগারী। যেমন– কোন ব্যক্তি এই আশংকায় শিকার করে না যে, সম্ভবতঃ শিকারটি কোন মানুষের হাত থেকে ছুটে চলে এসেছে। কাজেই শিকার করলে অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা হবে। এ ধরনের সাবধানতার নাম ওয়াসওয়াসা। সন্দিগ্ধ বিষয়ের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

তৃতীয় স্তরের পরহেযগারীর প্রমাণ হচ্ছে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর এই উক্তি–

لايبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لاباس به مخافة مما به باس.

অর্থাৎ, বান্দা মুত্তাকীর স্তরে পৌঁছবে না যে পর্যন্ত দোষযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার আশংকায় দোষমুক্ত বিষয় বর্জন না করে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমরা হালালের নবম দশম অংশ বর্জন করতাম এই আশংকায় যে, কোথাও হারামে লিপ্ত না হয়ে পড়ি। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন ঃ পূর্ণ হওয়ার উপায় হল বিন্দু পরিমাণ বিষয়েও তাকওয়া অবলম্বন করা । এমন কি, হালাল মনে করা হয়– এমন কোন

কোন বিষয়কেও হারাম হওয়ার ভয়ে বর্জন করা। এই বর্জন তাকওয়াকারী ও দোযখের আগুনের মাঝে আড়াল হয়ে যাবে। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ এক ব্যক্তির কাছে একশ' দেরহাম পাওনা ছিলেন। লোকটি তা নিয়ে এলে তিনি নিরানব্বই দেরহাম গ্রহণ করলেন। কোথাও বেশী হয়ে যায়– এই আশংকায় তিনি সম্পূর্ণ দেরহাম নিলেন না। জনৈক ব্যবসায়ী বুযুর্গ যখন অন্যের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য নিতেন, তখন একরতি কম নিতেন এবং যখন অপরকে দিতেন, তখন বেশী দিতেন। যেসব বিষয়কে মানুষ সাধারণতঃ কিছু মনে করে না এবং চোখ বন্ধ করে রাখে, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকাও এ পর্যায়ের পরহেযগারী। যদিও ফতোয়ার দৃষ্টিতে এগুলো হালাল, কিন্তু একবার দরজা খুলে গেলে মানুষ অন্য গুরুতর কাজও নির্দ্বিধায় করে নিতে পারে। এমনি এক ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আলী ইবনে মা'বাদ (রহঃ) বলেন ঃ আমি একটি ভাড়ার ঘরে বসবাস করতাম। একবার একটি চিঠি লেখে দেয়ালের মাটি দিয়ে চিঠিটি শুকাতে চাইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, দেয়াল আমার মালিকানাধীন নয়, কিন্তু আমার মন (নফস) বলে উঠল ঃ এটুকু মাটির অস্তিত্বই কি! সেমতে আমি মাটি নিয়ে কাজ সেরে নিলাম। এর পর ঘুমালে স্বপ্ন দেখলাম, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলছে ঃ মিয়া সাহেব, যে বলে এতটুকু মাটির হাকিকত কি? তার অবস্থা আগামীকল্য জানতে পারবে। এর অর্থ সম্ভবতঃ কেয়ামতে এরূপ ব্যক্তি মুত্তাকীদের মর্তবা পাবে না। এই অর্থ নয় যে, এ কাজের জন্যে কোন আযাব ভোগ করতে হবে। এ ধরনের আর একটি বর্ণনা– খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) এর কাছে বাহরাইন থেকে মেশক এলে তিনি বললেন ঃ আমার মনে হয়, কোন মহিলা এই মেশ্‌ক মেপে এর পর তা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করলে ভাল হত। তাঁর স্ত্রী আতেকা বললেন ঃ আমি মাপতে পারি। হযরত ওমর কোন জওয়াব না দিয়ে আবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন। আতেকা আবার বললেন ঃ আমি মাপতে পারি। হযরত ওমর বললেন ঃ আমি চাই না, তুমি মাপার পর নিক্তির ধূলিকণা নিজের ঘাড়ে মেখে নাও । যার ফলে অন্য মুসলমানদের তুলনায় এই মেশ্‌ক দ্বারা আমি অধিক লাভবান হই। খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ)-এর সামনে মুসলমানদের জন্যে মেশ্‌ক মাপা হচ্ছিল। তিনি নিজের নাক বন্ধ করে নিলেন, যাতে সুগন্ধি প্রবেশ না করে। লোকেরা এই অবান্তর কাজের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন

ঃ মেশ্‌কের উপকারিতা তো সুগন্ধিই। আমি অন্যের চেয়ে বেশী উপকার লাভ করব কেন? শৈশবে হযরত ইমাম হুসাইন (আঃ) যাকাতের খোরমা থেকে একটি খোরমা হাতে তুলে নিলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ ছিঃ ছিঃ অর্থাৎ, রেখে দাও।

চতুর্থ স্তরের পরহেযগারী হচ্ছে সিদ্দীকগণের পরহেযগারী । তাঁদের মতে যে বস্তু আল্লাহ্‌র জন্যে নয় তাই হারাম। তাঁরা এই আয়াত অনুযায়ী আমল করেন–

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ

অর্থাৎ, আপনি বলুন আল্লাহ। এর পর তাদেরকে তাদের বাজে কথা নিয়ে খেলা করতে দিন।

সিদ্দীক তারা, যারা আল্লাহ্‌কে এক বলে এবং কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে একান্ত ভাবে তাঁরই জন্য নিবেদিত থাকে। তাঁরা গোনাহের কাজ করেন না; পরন্তু এমন কাজও করেন না, যার মূলে কোন গোনাহ মিলিত থাকে । সেমতে হযরত বিশরে হাফী (রহঃ) শাসকবর্গের খনন করা খালের পানি পান করতেন না। কেননা, খাল পানি প্রবাহিত হওয়ার এবং তাঁর কাছে পৌছার কারণ ছিল। যদিও পানি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বৈধ, কিন্তু এতে এমন খাল দ্বারা উপকার লাভ করা হত, যা হারাম অর্থে খনন করা হয়েছিল।

মোট কথা, পরহেযগারীর একটি হচ্ছে সূচনা । তা হল, ফতোয়া যাকে হারাম বলে তা থেকে বেঁচে থাকবে। একে বলা হয় আবেদদের পরহেযগারী। আর একটি হচ্ছে পরহেযগারীর শেষ প্রান্ত । অর্থাৎ, সিদ্দীকগণের পরহেযগারী তা এই যে, যেসব বস্তু আল্লাহ্‌র জন্যে নয়; বরং খাহেশের তাড়নায় লাভ করা হয়েছে অথবা অপছন্দনীয় পন্থায় পাওয়া গেছে, অথবা যেসব মাকরূহ, সেসবগুলো থেকে বেঁচে থাকবে। এই দু'প্রান্তের মাঝখানে সাবধানতার অনেক স্তর রয়েছে। মানুষ প্রবৃত্তির ব্যাপারে যত বেশী সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং পাপের পাল্লা ভারী হওয়া থেকে দূরে থাকবে, আখেরাতের স্তর তেমনি বিভিন্ন হবে, যেমন দুনিয়াতে পরহেযগারীর স্তর বিভিন্ন হবে। হারাম মালের পার্থক্য অনুযায়ী জালেমদের জন্যে দোযখের স্তর ভিন্ন ভিন্ন হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহের স্তর ও স্থানভেদ

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لايعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بعرضه ودينه ومن وقع فى الشبهات وقع الحرام كالراعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه ـ

অর্থাৎ, হালাল সুস্পষ্ট ও হারাম সুস্পষ্ট। এতদুভয়ের মাঝখানে রয়েছে সন্দিগ্ধ বিষয়সমূহ। অনেকেই এগুলো জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বিষয় থকে বেঁচে থাকে, সে নিজের ইযযত ও ধর্ম পরিচ্ছন্ন করে নেয়। আর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বিষয়ে পতিত হয়, সে হারামে লিপ্ত হয়; যেমন রাজকীয় শিকার ক্ষেত্রের আশেপাশে যে পশু চরানো হয় সেগুলো প্রায়ই তাতে ঢুকে পড়ে। এই হাদীসে তিন প্রকারেরই স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে মধ্যবর্তী প্রকারটি কঠিন, যা অনেকেই জানে না। অর্থাৎ, সন্দিগ্ধ বিষয়। তাই এর বর্ণনা ও এর স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা আবশ্যক। কেননা, অধিকাংশ মানুষ যা জানে না, কম সংখ্যক মানুষ তা জানে। অতএব আমরা বলি, স্পষ্ট হালাল সেই বস্তু, যার সত্তা থেকে হারাম হওয়ার কারণাদি আলাদা থাকে এবং যাতে হারাম অথবা মাকরূহ হওয়ার কারণাদির কোন দখল থাকে না। এর দৃষ্টান্ত বৃষ্টির সেই পানির মত, যা বর্ষিত হওয়ার সময় মানুষ নিজের জমি অথবা বৈধ জমিতে দাঁড়িয়ে সংগ্রহ করে নেয়। পক্ষান্তরে নির্ভেজাল হারাম সেই বস্তু, যাতে হারামকারী কোন গুণ সন্দেহাতীতরূপে বিদ্যমান থাকে; যেমন শরাবের তীব্র মাদকতা গুণ এবং প্রস্রাবে নাপাকী গুণ অথবা যে বস্তু কোন অকাট্যরূপে নিষিদ্ধ উপায়ে অর্জিত হয়; যেমন জুলুম, সুদ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ। এই দুই প্রান্ত সুস্পষ্ট। এগুলোতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই উভয় প্রান্তে সেই বস্তুও অন্তর্ভুক্ত যা হালাল বলে জানা রয়েছে, কিন্তু অপরের হওয়ারও সম্ভাবনা বিদ্যমান। তবে এই সম্ভাবনার পক্ষে ধরে নেয়া

ও কল্পনা ছাড়া কোন কারণ নেই। যেমন, স্থল অথবা জলের শিকার হালাল, কিন্তু কেউ হরিণ শিকার করলে তাতে এই সম্ভাবনাও থাকে যে, এটি কেউ পূর্বে শিকার করেছিল এবং তার হাত থেকে ছুটে গেছে। অনুরূপভাবে কেউ মাছ ধরলে তাতে সম্ভাবনা থাকে যে, পূর্বে কেউ ধরেছিল এবং তার হাত থেকে পিছলে পানিতে পড়ে গেছে। যেহেতু এই সম্ভাবনার কোন কারণ নেই; তাই এ শিকারও স্পষ্ট হালালের অন্তর্ভুক্ত। এই সম্ভাবনাকে ওয়াসওয়াসা তথা অমূলক সংশয় মনে করা উচিত। এ থেকে বেঁচে থাকাকে আমরা সংশয়বাদী তথা কল্পনাকারীদের পরহেযগারী বলব। এটা সন্দিগ্ধ বিষয়ের মধ্যে গণ্য। বরং সন্দিগ্ধ বিষয় তাই, যার হালাল হওয়া ও হারাম হওয়ার অবস্থা আমাদের উপর সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়; অর্থাৎ, দু'রকম বিশ্বাস দু'রকম কারণ থেকে উৎপন্ন হওয়া এবং একটিও অগ্রগণ্য না হওয়া। এখন জানা উচিত, সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্র চারটি।

প্রথম ক্ষেত্র, উভয় সম্ভাবনা সমান থাকবে অথবা একটি প্রবল হবে। যদি উভয় সম্ভাবনা সমান থাকে, তবে যে বিধান পূর্বে জানা থাকবে, তাই বহাল থাকবে। সন্দেহের কারণে অন্য বিধান দেয়া হবে না। পূর্বের বিধান দেখে বর্তমানের উপর সেই বিধান বহাল রাখার এই প্রকারকে বলা হয় 'এস্তেসহাব।' পক্ষান্তরে যদি ধর্তব্য অর্থ জ্ঞাপনের মাধ্যমে এই সম্ভাবনা প্রবল থাকে তবে প্রবল সম্ভাবনা অনুযায়ী বিধান হবে। এ বিষয়টি উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত ছাড়া স্পষ্ট হবে না। তাই আমরা একে চার ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথমতঃ হালাল হওয়ার ব্যাপারে পূর্ব থেকে জানা না থাকা। এর পর হালাল হওয়ার কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া। এরূপ সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি শিকার লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করল। শিকার আহত হয়ে পানিতে পড়ে গেল। এর পর শিকারটি মৃত পাওয়া গেল। এখানে জানা নেই যে, পানিতে ডুবে মরেছে, না তীরের আঘাতে মরেছে? অতএব এ শিকার খাওয়া হারাম। কেননা, এক বিশেষ পন্থায় মরা ছাড়া শিকারটি হারাম ছিল। এখন এই বিশেষ পন্থার মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেছে। সুতরাং মিশ্রিত বিধানটি সন্দেহের কারণে পরিত্যক্ত হবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই পরিস্থিতিতেই আদী ইবনে হাতেমকে বলেছিলেন ঃ এই শিকার খেয়ো না। সম্ভবতঃ তোমার কুকুর ছাড়া অন্য কিছু একে হত্যা করেছে। এ কারণেই রসূলে করীম (সাঃ)-এর

কাছে যখন কোন বস্তু আসত এবং সেটি সদকা, না হাদিয়া সে বিষয়ে সন্দেহ থাকত, তখন তিনি জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন।

বর্ণিত আছে, তিনি এক রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করলে জনৈক পত্নী কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ আমি একটি খোরমা পেয়ে খেয়ে নিয়েছি। এখন এটি সদকা ছিল কিনা, সেই আশংকায় ঘুম হয়নি। দ্বিতীয় প্রকার হল, হালাল হওয়া পূর্ব থেকে জানা। এখন হারাম হওয়ার কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। এখানে হালালের বিধানই বহাল থাকবে। উদাহরণতঃ দু'জন পুরুষ দু'জন মহিলাকে বিবাহ করল। আকাশে একটি উড়ন্ত পাখী দেখে একজন বলল ঃ এটা কাক হলে তার স্ত্রী তালাক। দ্বিতীয় জন বলল ঃ এটা কাক না হলে তার স্ত্রী তালাক। এরপর অবস্থা পরিষ্কার হওয়ার পূর্বেই পাখীটি অদৃশ্য হয়ে গেল। এখানে কোন স্ত্রীই তালাক হবে না। তৃতীয় প্রকার, আসলেই হারাম হওয়া, কিন্তু তাতে এমন বিষয় প্রকাশ পায়, যা প্রবল ধারণা অনুযায়ী হালাল হওয়া ওয়াজিব করে। এরূপ বস্তু সন্দিগ্ধ হয়ে থাকে। এর বিধান হচ্ছে, প্রবল ধারণাটি শরীয়তসম্মত ও ধর্তব্য কি-না তা দেখা উচিত। শরীয়তসম্মত হলে বস্তুটি হালাল হবে এবং তা থেকে বেঁচে থাকা পরহেযগারীর অন্তর্ভুক্ত হবে। উদাহরণতঃ শিকারের গায়ে তীর নিক্ষেপ করার পর তা দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। এর পর কোথাও মৃত পাওয়া গেল। তীর ছাড়া অন্য কোন জখম সেটির গায়ে নেই। এখানে পড়ে যাওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে মরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইমাম শাফেয়ীর উক্তি অনুযায়ী এই শিকারটি হালাল। এমনি মাসআলায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আদী ইবনে হাতেমকে শিকার খেতে নিষেধ করেছেন। এটা পরহেযগারী ও তানযিহীস্বরূপ নিষেধ। কেননা, কোন কোন রেওয়ায়েতে এরূপ শিকার খাওয়ার অনুমতিও বর্ণিত আছে। চতুর্থ প্রকার, আসলে হালাল হওয়া, কিন্তু তার মধ্যে এমন শরীয়তসম্মত ও ধর্তব্য বিষয় প্রকাশ পায়, যা প্রবল ধারণা অনুযায়ী হারাম হওয়া ওয়াজিব করে। এখানে বস্তুটি হারাম বলেই বিধান দেয়া হবে। উদাহরণতঃ পানির দু'টি পাত্রের মধ্যে থেকে একটি সম্পর্কে যদি প্রবল ধারণা হয় যে, এটি নাপাক, তবে সে পাত্রের পানি পান করা অথবা তা দিয়ে ওযু করা হারাম হবে। তবে এই প্রবল ধারণা তখনই ধর্তব্য হবে, যখন বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান কোন আলামতের সাথে এর সম্পর্ক থাকবে।

সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার দ্বিতীয় পর্যায় হল, হারাম ও হালাল বস্তু পরস্পরে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে পড়া যাতে পার্থক্য করা যায় না। এর কয়েকটি প্রকার আছে।

প্রথম প্রকার, কোন সীমিত বস্তু সীমিত বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়; যেমন একটি মৃত ছাগল যবেহ্ করা একটি অথবা দশটি ছাগলের সাথে মিশে যাওয়া, অথবা দু'ভগিনীর একজন বিবাহ করার পর সন্দেহ হওয়া যে, কোন্ ভগিনীকে বিবাহ করেছিল। এ ধরনের সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব। কেননা, এতে আলামত ও ইজতিহাদের কোন দখল নেই। এছাড়া সীমিত বস্তুর মধ্যে মিশ্রণ হওয়ার কারণে সবগুলো মিলে যেন এক বস্তু হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার, সীমিত হারাম বস্তু সীমাহীন হালাল বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়ে যাওয়া; যেমন একজন অথবা দশ জন দুধ শরীক মহিলা কোন বড় শহরের মহিলাদের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাওয়া। এমতাবস্থায় সমগ্র শহরের মহিলাদের বিবাহ করা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য নয়। বরং যাকে ইচ্ছা বিবাহ করা যায়। এর প্রমাণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যমানায় একটি ঢাল চুরি হয়ে গিয়েছিল, এ কারণে দুনিয়াতে কেউ ঢাল ক্রয় করা থেকে বিরত থাকেনি। মোট কথা, দুনিয়া হারাম থেকে তখনই বাঁচতে পারে, যখন দুনিয়ার সকল মানুষ গোনাহ্ পরিত্যাগ করবে। সুতরাং দুনিয়াতে যখন এ ধরনের বেঁচে থাকা শর্ত নয়, তখন শহরেও শর্ত হবে না। এখন প্রশ্ন হয়, আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানে তো সকল বস্তুই সীমিত। এমতাবস্থায় এখানে সীমিত ও সীমাহীন বস্তুর সংজ্ঞা কি? মানুষ ইচ্ছা করলে কোন শহরের বাসিন্দাদের গণনা করতে পারে। সুতরাং এটা সীমাহীনের দৃষ্টান্ত হবে কিরূপে? এর জওয়াব, এ ধরনের বিষয়সমূহের সংজ্ঞা নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে কাছাকাছি সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়। সেমতে আমরা বলি, সীমাহীন বস্তুর সংজ্ঞা এই যে, যদি এক মাঠে সকলেই সমবেত হয়, তবে দর্শক দেখা মাত্রই তাদেরকে গণনা করা কঠিন মনে করে; যেমন হাজার দু'হাজার, তবে তা সীমাহীন। আর যদি সহজেই গণনা করা যায়; যেমন দশ বিশ জন, তবে সীমিত। এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সংখ্যাসমূহকে প্রবল ধারণার মাধ্যমে যে কোন একদিকে মিলিয়ে দেয়া হয়। যে সংখ্যায় সন্দেহ দেখা দেয়, তাতে মন থেকে ফতোয়া নেয়া উচিত। কারণ, যা গোনাহ, তা মনে বাজে। এরূপ ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সাঃ)

হযরত ওয়াবেসাকে বলেছিলেন ঃ

استفت قلبك وان افتوك وامروك

অর্থাৎ, নিজের মনের কাছে ফতোয়া চাও, যদিও লোকেরা তোমাকে ফতোয়া দেয় এবং আদেশ করে।

বলাবাহুল্য, মুফতী বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে ফতোয়া দেয় এবং আল্লাহ তা'আলা আভ্যন্তরীণ অবস্থার মালিক। মুফতীর ফতোয়া মানুষকে আখেরাতে গোনাহ থেকে মুক্তি দেবে না।

তৃতীয় প্রকার হল সীমাহীন হালাল সীমাহীন হারামের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাওয়া। যেমন, আজকালকার ধন দৌলত। এধরনের মিশ্রণের ফলে কোন নির্দিষ্ট বস্তু হারাম হয় না, যাতে হালাল ও হারাম হওয়ার উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। হাঁ, যদি তাতে হারাম হওয়ার কোন লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তবে তা হারাম হবে, কিন্তু লক্ষণ না থাকলে সেই বস্তু বর্জন করা পরহেযগারী এবং গ্রহণ করা হালাল। সেটি খেলে মানুষ ফাসেক হবে না। হারাম হওয়ার লক্ষণসমূহ পরে বর্ণিত হবে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, সেই বস্তুটি জালেম শাসনকর্তার কাছ থেকে পাওয়া। বর্ণিত এই বিধানের প্রমাণ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের যমানায় সুদের টাকা এবং শরাবের মূল্য যিম্মীদের কাছ থেকে আদায় হয়ে সরকারী ধন-সম্পদের সাথে মিশে যেত। সুদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বলেছিলেন– আমি সর্বপ্রথম আব্বাসের সুদ ছেড়ে দিচ্ছি, তখন সকলেই সুদের লেনদেন বর্জন করেনি, যেমন শরাব বিক্রি করা কেউ বর্জন করেনি। সেমতে বর্ণিত আছে– জনৈক সাহাবী শরা বিক্রি করলে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ অমুকের প্রতি আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত হোক। সে সর্বপ্রথম শরাব বিক্রি করার প্রথা চালু করেছে। এ বিক্রয়ের কারণ ছিল, কেউ কেউ শরাব হারাম হওয়ার ফলে শরাব বিক্রয় এবং শরাবের মূল্যও হারাম হয়ে গেছে একথা বুঝতে পারেনি।

এযীদের সৈন্যরা তিন দিন পর্যন্ত মদীনা তাইয়েবা লুট করেছিল। কয়েকজন সাহাবী জালেম শাসকদের লুটতরাজের এই যুগ পেয়েছিলেন, কিন্তু মদীনার লুটের মাল হতে পারে -এই আশংকায় কোন সাহাবীই বাজারে ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করে দেননি। সুতরাং তাঁরা এই মিশ্রণকে বাধা

মনে করেননি। পূর্ববর্তীগণ যে বিষয় অপরিহার্য করেননি, এখন যদি কেউ সেটাকে অপরিহার্য করে নেয় এবং ধারণা করে, সে শরীয়তের এমন বিষয় বুঝে নিয়েছে, যা পূর্ববর্তীরা বুঝতে পারেনি, তবে সে পাগল। পূর্ববর্তীরা শরীয়তের জ্ঞান আমাদের তুলনায় অনেক বেশী রাখতেন। তাঁদের চেয়ে বেশী শরীয়ত বুঝা আমাদের যে কোন ব্যক্তির জন্যে অসম্ভব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর যমানায় সুদ, চুরি, লুটতরাজ, গনীমত সামগ্রীর খেয়ানত ইত্যাদি হালাল ধনসম্পদের তুলনায় অনেক কম ছিল, কিন্তু আমাদের যুগে লেনদেনের ভ্রষ্টতা ও শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য না রাখার কারণে, সুদের প্রাচুর্য এবং জালেম শাসকদের বাড়াবাড়ির কারণে মানুষের অধিকাংশ ধনসম্পদ দূষিত ও হারাম হয়ে যাচ্ছে। অতএব এসব ধনসম্পদ কেউ পেলে এবং তাতে কোন বিশেষ লক্ষণ না থাকলে হালাল বলা হবে, না হারাম? জওয়াব হচ্ছে, এই মাল হারাম নয়। তবে এটা গ্রহণ না করাই পরহেযগারীর মধ্যে দাখিল।

সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার তৃতীয় স্থান হল, যে কারণে বস্তু হালাল হয়, তাতে কোন গোনাহ্ সংযুক্ত হয়ে যাওয়া। এই গোনাহ হয় কারণের ইঙ্গিত অর্থাৎ, সঙ্গের বস্তুর মধ্যে; অথবা পরিণতির মধ্যে, অথবা ভূমিকার মধ্যে, অথবা বিনিময়ের মধ্যে সংযুক্ত হবে। সর্বাবস্থায় গোনাহটি এমন না হওয়া শর্ত, যা দ্বারা আকদ বা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। এখন এই চার প্রকার গোনাহের উদাহরণ বর্ণিত হচ্ছে।

ইঙ্গিতের মধ্যে গোনাহ্ হওয়ার উদাহরণ জুমুআর দিনে আযানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করা। এক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে, কিন্তু এ থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের আকদ তথা চুক্তি বাতিল হওয়া বুঝা যায় না। অতএব এ থেকে বিরত থাকা অবশ্য পরহেযগারীর অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে হারামের বিধান প্রযোজ্য হবে না এবং এর নাম সন্দেহ রাখাও ভুল। কেননা, সন্দেহের ব্যবহার অধিকাংশ দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। এখানে কোন দ্বিধা নেই।

পরিণতির মধ্যে গোনাহ্ সংযুক্ত হওয়ার উদাহরণ শরাব প্রস্তুতকারীর কাছে আঙ্গুর বিক্রি করা অথবা দস্যুদের কাছে তরবারি বিক্রি করা। এধরনের বিক্রি শুদ্ধ কি-না, এ ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। কিয়াস অনুযায়ী এই ক্রয় বিক্রয় শুদ্ধ এবং মূল্য হালাল, তবে বিক্রয়কারী

গোনাহগার হবে; যেমন ছিনতাই করা ছুরি দিয়ে যবেহ্ করলে গোনাহগার হয় এবং যবেহ করা জন্তু হালাল হয়। বিক্রেতার গোনাহ্ এ কারণে হয় যে, সে গোনাহের কাজে অপরকে সাহায্য করে। মূল্য মাকরূহ এবং তা গ্রহণ না করা পরহেযগারী– হারাম নয়।

ভূমিকায় গোনাহ সংযুক্ত হওয়ার তিন স্তর। সর্ববৃহৎ স্তরের উদাহরণ সেই ছাগলের গোশত খাওয়া; যে নিষিদ্ধ চারণ ভূমিতে ঘাস খেয়েছে। এটা কঠিন মাকরূহ। এই গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব না হলেও জরুরী পরহেযগারী। পূর্ববর্তী অনেক বুযুর্গ থেকে এই পরহেযগারী বর্ণিত রয়েছে। সেমতে আবু আবদুল্লাহ্ তূসী (রহঃ)-এর একটি ছাগল ছিল, সেটির দুধ তিনি পান করতেন। তিনি প্রত্যহ ছাগলটিকে কাঁধে তুলে জঙ্গলে ছেড়ে আসতেন। ছাগল ঘাস খেত এবং তিনি নামায পড়তেন। একদিন এক অসাবধান মুহূর্তে ছাগলটি এক ব্যক্তির বাগানের ধারে আঙ্গুরের পাতা খেতে লাগল। এর পর তিনি ছাগলটি বাগানেই ছেড়ে এলেন; বাড়ি আনা হালাল মনে করলেন না। দ্বিতীয় স্তরের উদাহরণ বিশর ইবনে হারেস থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সেই পানি পান থেকে বিরত থাকেন, যা জালেম শাসকদের খনন করা খালে প্রবাহিত হত। অপর একজন বুযুর্গ সেই বাগানের আঙ্গুর খাননি, যাতে জালেমদের খনন করা খাল থেকে পানি দেয়া হয়েছিল। তৃতীয় স্তরের উদাহরণ এমন হালাল খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত থাকা, যা কোন গোনাহগারের হাতে পরিবেশিত হয়; যেমন কোন ব্যভিচারী কোন হালাল খাদ্য পরিবেশন করলে তা না খাওয়া, কিন্তু এরূপ বিরত থাকা ওয়াসওয়াসার নিকটবর্তী এবং বাড়াবাড়ি। কেননা, ব্যভিচার দ্বারা কোন বস্তু পরিবেশন করার শক্তি অর্জিত হয় না। এধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা হলে পরিণামে এরূপ ব্যক্তির হাত থেকেও কোন বস্তু নেয়া যাবে না, যে গীবত, মিথ্যাচার অথবা এধরনের কোন কোন গোনাহ করে। এটা খুবই বাড়াবাড়ি।

উপরোক্ত তিনটি স্তরের মধ্যে কেবল প্রথম স্তরটি মুফতীর ফতোয়ার আওতায় পড়ে। পরবর্তী দু'টি স্তর ফতোয়ার বাইরে। এগুলো সম্পর্কে ফতোয়া তাই, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওয়াবেসা (রাঃ)-কে বলেছিলেন– মানুষ তোমাকে ফতোয়া দিলেও তুমি মনের কাছে ফতোয়া চাও। এটা মুত্তাকী ও সালেহ ব্যক্তিবর্গের পরহেযগারী। বাস্তবে তাঁরা মন থেকে ফতোয়া জেনে নেন। গোনাহ তাঁদের অন্তরে বাজে।

চতুর্থ স্থান প্রমাণাদির পরস্পর বিরোধিতার কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া। এটা তিন প্রকারে বিভক্ত– (১) শরীয়তের প্রমাণাদির বৈপরীত্য, (২) লক্ষণ বৈপরীত্য এবং (৩) সামঞ্জস্যশীল বিষয়াদির বৈপরীত্য।

প্রথম প্রকার, শরীয়তের দলীলসমূহের বৈপরীত্য; যেমন কোরআন পাকের দুই আয়াত অথবা দুই হাদীস অথবা দুই কিয়াসের পরস্পর বিরোধী হওয়া। বৈপরীত্যের এ সবগুলো প্রকারই সন্দেহের কারণ হয়ে থাকে। এতে যদি হারাম হওয়ার দিকটি অগ্রগণ্য হয়, তবে এটাই অবলম্বন করা ওয়াজিব। আর যদি হালাল হওয়ার দিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য হয়, তবে তা অবলম্বন করা জায়েয, কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকা ভাল। পরহেযগারীর ক্ষেত্রে বিরোধের স্থান থেকে বেঁচে থাকা মুফতী ও মুকাল্লেদ উভয়ের জন্যে জরুরী। তবে মুকাল্লেদ শহরের যে মুফতীকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করবে, তার ফতোয়া অনুযায়ী আমল করা তার জন্যে জায়েয। মুফতীর সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া জনশ্রুতি দ্বারা জানা যায়। যেমন, চিকিৎসকদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তা মানুষের কাছে শুনে নির্ণয় করা যায়। ফতোয়া প্রার্থীর জন্যে সুবিধামত মাযহাব বেছে নেয়া জায়েয নয়; বরং যে মাযহাব তার কাছে শ্রেষ্ঠ মনে হয়, সেই মাযহাবের অনুসরণ এমনভাবে করবে, যেন কখনও তার বিরুদ্ধাচরণ না হয়। হাঁ, যদি তার মাযহাবের ইমাম কোন বিষয়ে ফতোয়া দেয় এবং এতে অন্য মাযহাবের ইমামের বিরোধ পাওয়া যায়, তবে এমনভাবে আমল করবে যাতে উভয় মাযহাবের উপর আমল হয়ে যায়। এখানে বিরোধ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী– পরহেযগারীর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে যদি মুজতাহিদের মতে প্রমাণসমূহ পরস্পর বিরোধী হয় এবং ধারণা ও অনুমান দ্বারা হালাল হওয়ার দিক অগ্রাধিকারযোগ্য মনে হয়, তবে মুজতাহিদের জন্যে পরহেযগারী হচ্ছে, সে বিষয় থেকে নিজে বেঁচে থাকবে এবং ফতোয়া হালাল বলে মেনে নেবে। সেমতে পূর্ববর্তী মুফতীগণ অনেক ব্যাপারে হালাল হওয়ার ফতোয়া দিতেন, কিন্তু পরহেযগারীবশতঃ নিজেরা তা করতেন না, যাতে সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।

দ্বিতীয় প্রকার, এমন লক্ষণসমূহের বৈপরীত্য, যেগুলো হালাল ও হারাম হওয়া জ্ঞাপন করে। উদাহরণতঃ কোন এক সময়ে লুণ্ঠিত এক প্রকার সামগ্রী বর্তমানে বাজারে দুর্লভ। এমন সামগ্রী যদি কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির কাছে পাওয়া যায়, তবে এখানে উভয় প্রকার লক্ষণ

বিদ্যমান। যার কাছে আছে, তার সততা ও ধর্মপরায়ণতা এটা হালাল হওয়ার প্রমাণ। পক্ষান্তরে এ সামগ্রীর দুর্লভ্যতা এবং লুটের মাল ছাড়া কম পওয়া যাওয়া এ বিষয়ের দলীল যে, এটা হারাম। সুতরাং এখানে পরস্পর বিরোধী দু'প্রকার লক্ষণের কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। এখানে যদি কোন এক দিক অগ্রাধিকারযোগ্য হয়, তবে তদনুযায়ী বিধান হবে, কিন্তু এ সামগ্রী থেকে বেঁচে থাকা হবে পরহেযগারী। অগ্রাধিকার প্রকাশ না পেলে 'তাওয়াক্কুফ' তথা বিধান মওকুফ রাখা ওয়াজিব হবে।

তৃতীয় প্রকার, সামঞ্জস্যশীল বস্তুসমূহের বৈপরীত্য; যেমন কোন ব্যক্তি ফকীহগণকে কোন মাল দান করার ওসিয়ত করল। এতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি ফেকাহ শাস্ত্রে পন্ডিত, সে এই ওসিয়তের অন্তর্ভুক্ত এবং যে ব্যক্তি একদিন অথবা এক মাস আগে ফেকাহ শুরু করেছে সে এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এতদ্দুভয়ের মধ্যবর্তী অসংখ্য স্তর রয়েছে, যেগুলোতে সন্দেহ দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে মুফতী তার ধারণা অনুযায়ী ফতোয়া দেন। সন্দেহের যত স্থান রয়েছে, তন্মধ্যে এ প্রকারটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কেননা, এর কোন কোন ক্ষেত্রে মুফতীকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। সে কোন কৌশল খুঁজে পায় না। দরিদ্রদের মধ্যে যে সদকা-খয়রাত বন্টন করা হয়, তার অবস্থাও তদ্রূপ। কেননা, যার কাছে কিছুই নেই, সে নিশ্চিতই দরিদ্র। আর যার কাছে অনেক ধন-সম্পদ আছে, সে নিশ্চিতই ধনী, কিন্তু এতদুভয়ের মাঝখানে অনেক সূক্ষ্ম স্তর রয়েছে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির কাছে একটি গৃহ, গৃহের আসবাবপত্র, বস্ত্র ও বই পুস্তক রয়েছে। এখন যদি এগুলো প্রয়োজন পরিমাণে থাকে, তবে তার সদকা গ্রহণের পথে কোন বাধা নেই। আর যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশী থাকে, তবে বাধা আছে, কিন্তু প্রয়োজনের কোন সীমা নির্ধারিত নেই। এটা অনুমান দ্বারা জানা যায় এবং অত্যধিক আলোচনা সাপেক্ষ ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে এ হাদীসটিই একমাত্র উপকারী– دع ما يريبك الى ما لا يريبك অর্থাৎ, সন্দেহের বিষয় পরিত্যাগ করে সন্দেহমুক্ত বিষয় অবলম্বন কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাপ্ত ধনসম্পদ যাচাই করা জরুরী

প্রকাশ থাকে যে, কেউ তোমার সামনে কোন খাদ্য অথবা হাদিয়া পেশ করলে অথবা তুমি তা থেকে ক্রয় করতে কিংবা দান গ্রহণ করতে চাইলে তা যাচাই করা জরুরী নয়। বরং কোন কোন অবস্থায় জিজ্ঞেস করা ও অবস্থা যাচাই করা ওয়াজিব এবং কোন কোন অবস্থায় হারাম। আবার কোন কোন অবস্থায় মোস্তাহাব ও কোন অবস্থায় মাকরূহ। তাই এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা হল, যেসব জায়গায় সন্দেহ হয়, সেখানেই জিজ্ঞেস ও যাচাই করা। সন্দেহের জায়গা সম্পদের মালিকের সাথে অথবা স্বয়ং সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। তাই বিষয়টি দু'টি শিরোনামে বর্ণনা করা হচ্ছে।

মালিকের অবস্থা যাচাই করা ঃ মালিকের অবস্থা তিন প্রকার হতে পারে– অজ্ঞাত, সন্দিগ্ধ অথবা কোন প্রকারে জ্ঞাত। অজ্ঞাত হওয়ার অর্থ, মালিকের সাথে এমন কোন ইঙ্গিত নেই, যদ্দ্বারা তার ভ্রষ্টতা ও জুলুম জানা যায়; যেমন সিপাহীর পোশাক অথবা পদক এবং সাধুতারও কোন আলামত নেই; যেমন সুফী, ব্যবসায়ী ও আলেমের পোশাক পরিচ্ছদ। উদাহরণতঃ তুমি কোন অখ্যাত গ্রামে পৌঁছে এমন এক ব্যক্তিকে পেলে, যার অবস্থা তোমার কিছুই জানা নেই এবং তার মধ্যে এমন কোন আলামতও নেই, যদ্দ্বারা তাকে সাধু কিংবা দুষ্ট বলা যায়। এরূপ ব্যক্তিকে বলা হবে অজ্ঞাত অবস্থাধারী। তাকে সন্দিগ্ধ বলা যাবে না। কেননা, কোন বিষয়ে পরস্পর বিরোধী দু'কারণ থেকে উদ্ভূত পরস্পর বিরোধী দু'বিশ্বাস থাকাকে বলা হয় সন্দেহ। এখানে কোন বিশ্বাসও নেই, কারণও নেই। অধিকাংশ ফেকাহবিদ অজ্ঞাত ও সন্দিগ্ধের পার্থক্য জানে না বিধায় বিষয়টি বর্ণিত হল।

এই প্রকার মালিকের ক্ষেত্রে বাহ্যিক বিধান হচ্ছে যাচাই না করা। অর্থাৎ, কোন অজ্ঞাত মালিক যদি তোমার সামনে খাদ্য পেশ করে অথবা হাদিয়া পাঠায় অথবা তুমি তার দোকান থেকে কিছু ক্রয় করতে চাও, তবে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করা জরুরী নয়। বরং তার মুসলমান হওয়া এবং বস্তুটি তার কব্জায় থাকাই তোমার গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে

এরূপ বলা অপরিহার্য নয় যে, জুলুম ও ভ্রষ্টতা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে বিধায় এ মালও তদ্রূপই হবে। এরূপ বললে এটা হবে ওয়াসওয়াসা এবং এতে বিশেষ মুসলমানের প্রতি কুধারণা হয়। অথচ কোন কোন কুধারণা গোনাহ। আমরা জানি, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) জেহাদে ও সফরে বিভিন্ন গ্রামে গমন করতেন এবং খানার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতেন না। শহরসমূহে গেলে বাজার থেকে বেঁচে থাকতেন না। অথচ হারাম মাল তাঁদের যমানায়ও বিদ্যমান ছিল। তাঁরা সন্দেহ ছাড়া কখনও যাচাই করেছেন বলে শুনা যায়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও সামনে যা আসত তার অবস্থা যাচাই করতেন না। বরং শুরুতে মদীনায় অবস্থানকালে কেউ কিছু প্রেরণ করলে তিনি সদকা না হাদিয়া তাও জিজ্ঞেস করে নিতেন। কেননা, তখন অবস্থার চাহিদা এমনিই ছিল। মদীনায় নিঃস্ব মুহাজিরগণ তাঁর কাছে থাকতেন। তাই প্রেরিত বস্তু সদকা হওয়ার ধারণাই প্রবল ছিল। এছাড়া দাতার মালিকানা এবং তার মুসলমান হওয়া একথা জ্ঞাপন করে না যে, বস্তুটি সদকা নয়। কেউ দাওয়াত করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তা কবুল করে নিতেন এবং সদকা থেকে খাওয়ানো হবে কিনা, তা জিজ্ঞেস করতেন না। কারণ, সদকার খাদ্য দ্বারা দাওয়াত করার অভ্যাস সাধারণতঃ নেই। উম্মে সুলায়ম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দাওয়াত করেছিলেন এবং এমন খাদ্য পেশ করেছিলেন, যাতে লাউ ছিল। এসব দাওয়াতে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন বলে কোথাও বর্ণিত নেই। মোট কথা, যার অবস্থা অজ্ঞাত, তার প্রতি সুধারণা রাখা এবং জিজ্ঞেস না করা উচিত। তবে কেউ যদি না জানা পর্যন্ত পেটে কিছু দিতে না চায়, তবে সেটা নিঃসন্দেহে ভাল কথা। তার উচিত তা না খাওয়া। জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন কি? খেতে হলে জিজ্ঞেস করা ছাড়াই খেয়ে নেবে। কেননা, জিজ্ঞেস করার অর্থ কষ্ট দেয়া, গোপনীয়তা ফাঁস করা এবং আতংকে ফেলে দেয়া। এটা নিঃসন্দেহে হারাম। মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার গোনাহ হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু খাওয়ার গোনাহের চেয়ে কম নয়। যদি তার অবস্থা অন্যের কাছে এমনভাবে জিজ্ঞেস করা হয় যে, সে জেনে নেয়, তবে তাতে কষ্ট আরও বেশী হয়। আর যদি সে জানতে না পারে, তবে এটা কুধারণা, গোপনীয়তা ফাঁস করা, গুপ্তচরবৃত্তি এবং গীবতের ভূমিকা। এই সবগুলো বিষয় একই আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ـ

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা অধিকাংশ ধারণা থেকে দূরে থাক; কারণ, কোন কোন ধারণা পাপ, তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না।

অনেক মূর্খ দরবেশ জিজ্ঞাসাবাদ করে মানুষকে আতংকগ্রস্ত করে এবং কর্কশ ও পীড়াদায়ক কথা বলে ফেলে। এটা শয়তান তাদের মনের মধ্যে সজ্জিত করে দেয়, যাতে তারা মানুষের মধ্যে হালালখোর বলে খ্যাত হয়ে যায়। ধর্মপরায়ণতাই এর কারণ হলে মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়ার ভয় তারা বেশী করত। এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের পছন্দনীয় তরীকা। যে ব্যক্তি তাঁদের চেয়ে বেশী পরহেযগার হতে চায়, সে গোমরাহ ও বেদআতী। কেননা, সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে– যদি কেউ ওহুদ পর্বতের সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবে তা সাহাবায়ে কেরামের এক রতি পরিমাণ স্বর্ণ দান করার সমান হবে না।এছাড়া রসূলে করীম (সাঃ) হযরত বরীরা (রাঃ)-এর প্রেরিত খাদ্য খেলে লোকেরা আরজ করল ঃ এই খাদ্য বরীরা সদকায় পেয়েছিল। তিনি বললেন ঃ এটা তার জন্যে সদকা ছিল, আমার জন্যে হাদিয়া। তিনি জিজ্ঞেস করলেন না, এই সদকা বরীরাকে কে দিয়েছিল? কেননা, সদকাদাতা তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিল।

মালিকের সন্দিগ্ধ হওয়ার অর্থ মালিকের সাথে সন্দেহ সৃষ্টিকারী কোন লক্ষণ পাওয়া যাওয়া। প্রথমে আমরা সন্দেহের আকার বর্ণনা করব, এর পর তার বিধান লেখব। সন্দেহের আকার এই যে, যে বস্তু মালিকের কব্জায় আছে, তার হারাম হওয়ার কোন প্রমাণ মালিকের দৈহিক গড়নে, পোশাকে অথবা কর্ম ও কথায় পাওয়া যায়। তার দৈহিক গড়ন উদাহরণতঃ জংলী দস্যু অথবা জালেমের মত; মোটা গোঁফ, মাথার চুল দুষ্কৃতকারীদের অনুরূপ। তার পোশাক উদাহরণতঃ জালেম সিপাহীদের মত। তার কর্ম ও কথার মধ্যে হালাল নয়, এমন বিষয়াদির প্রতি সাহসিক উদ্যম পাওয়া যায়। এসব লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাবে, এ লোকটি সম্পদের ব্যাপারেও অসাবধানতার পক্ষপাতী হবে। যে মাল হালাল নয়, তাও গ্রহণ করে থাকবে। মোট কথা, এগুলো হচ্ছে সন্দেহের আকার আকৃতি। এরূপ ব্যক্তির কাছ থেকে কেউ কিছু কিনতে অথবা হাদিয়া

গ্রহণ করতে অথবা দাওয়াত কবুল করতে চাইলে দেখতে হবে, এখানে কব্জা একটি দুর্বল দলীল এবং তার বিপরীতে এমন সব লক্ষণ বিদ্যমান, যদ্দ্বারা সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেছে। কাজেই এগুলো করা জায়েয না হওয়া উচিত। এ বিধানকেই আমরা পছন্দ করি এবং ফতোয়াও তাই দেই। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করতে এবং সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে বলেছেন। হাদীসে এটা করা বাহ্যতঃ ওয়াজিব বুঝা গেলেও মোস্তাহাব হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এছাড়া এরূপ সন্দেহের স্থলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সদকা, না হাদিয়া জিজ্ঞেস করেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর গোলামের উপার্জনের অবস্থা জানতে চেয়েছেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) দুধের অবস্থা যাচাই করেছিলেন। এগুলো সব সন্দেহের ক্ষেত্রে হয়েছিল। এগুলোকে পরহেযগারী মনে করা সম্ভব নয়। কেননা, এসব লক্ষণ অধিকার ও মুসলমানিত্বের পরিপন্থী।

তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে মালিকের অবস্থা সম্পর্কে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, যদ্দ্বারা সম্পদের হালাল হওয়ার প্রবল ধারণা জন্মে। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তির বাহ্যিক সাধুতা ও ধর্মপরায়ণতা জানা থাকা, কিন্তু আভ্যন্তরীণ অবস্থা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত হতে পারে বিধায় সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা এবং যাচাই করা জরুরী নয়; বরং এখানে আরও উত্তমরূপে নাজায়েয হওয়া উচিত। কেননা, বাহ্যিক সাধু ব্যক্তির হারাম মাল নিতে উদ্যত হওয়া অজ্ঞাত ব্যক্তির উদ্যত হওয়ার তুলনায় সন্দেহ থেকে অনেক দূরে। এ ছাড়া ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের খাদ্য আহার করা নবী ও ওলীগণের অভ্যাস। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لا تاكل الا طعام الاتقى ولا ياكل طعامك الا الاتقى ـ

অর্থাৎ, তুমি পরহেযগারদের খাদ্য ছাড়া খেয়ো না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার ছাড়া কেউ না খায়, কিন্তু যদি অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা যায়, লোকটি জালেম, গায়ক অথবা সুদখোর, তবে অভিজ্ঞতার সামনে বাহ্যিক পোশাক ও পরহেযগারীর কোন মূল্য নেই। এরূপ ক্ষেত্রে যাচাই করা অবশ্যই ওয়াজিব।

সম্পদ সম্পর্কিত যাচাই ঃ হারাম ও হালাল সম্পদ মিশ্রিত হয়ে গেলে যাচাই করতে হয়। যেমন প্রচুর পরিমাণ চোরাই মাল বাজারীরা

ক্রয় করে নিল। এরূপ ক্ষেত্রে যদি প্রকাশ পায় যে, বাজারীদের অধিকাংশ মাল চোরাই তথা হারাম মাল, তবে যে ব্যক্তি এ বাজার থেকে ক্রয় করবে, তার উপর যাচাই করে নেয়া ওয়াজিব। আর যদি প্রকাশ পায়, বাজারীদের অধিকাংশ মাল হারাম নয়, তবে যাচাই করা ওয়াজিব নয়; বরং তা পরহেযগারীর অন্তর্ভুক্ত। এর দলীল হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম বাজারে ক্রয় থেকে বিরত থাকতেন না; অথচ এসব বাজারে সুদের দেরহাম এবং গনীমতে খেয়ানতের মালও থাকত। হযরত ওমর (রাঃ) আযারবাইজানে প্রেরিত পত্রে লেখেছিলেন ঃ তোমরা এমন শহরে রয়েছ, যেখানে মৃত জন্তুর চামড়া শুকানো হয়। অতএব যবেহ করা ও মৃত জন্তুর ব্যাপারটি যাচাই করে নিয়ো। এতে যাচাই করার নির্দেশ পাওয়া যায়, কিন্তু এর সাথে তিনি এই নিদের্শ দেননি যে, নগদ টাকা-পয়সাও যাচাই করে নাও, সেটা মৃত জন্তুর চামড়ার মূল্য, না যবেহ করা জন্তুর চামড়ার মূল্য? কেননা, চামড়া বিক্রি হলেও অধিকাংশ নগদ টাকা-পয়সা চামড়ার দাম ছিল না, কিন্তু চামড়া অধিকাংশ মৃত জন্তুরই হত। তাই এগুলো যাচাই করার নিদের্শ দিলেন।
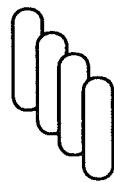
চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আর্থিক দায়দায়িত্ব থেকে তওবাকারীর মুক্তির উপায়

প্রকাশ থাকে যে, তওবাকারীর কাছে হালাল হারাম উভয় প্রকার মাল মিশ্রিত থাকলে তার জন্যে দু'টি কাজ করা অপরিহার্য। প্রথম নিজের মাল থেকে হারাম মালকে পৃথক করা এবং দ্বিতীয়তঃ হারাম মাল ব্যয় করা। সেমতে এই পরিচ্ছেদটি দু'টি শিরোনামে বর্ণিত হচ্ছে।

হারাম মাল পৃথক করা ঃ জানা উচিত, যে ব্যক্তি তওবা করে, তার নিকট হারাম মাল থাকলে তা আলাদা করতে হবে। তার মিশ্রিত মাল হয় ওজন করা যায়– এমন হবে, যথা খাদ্য শস্য, তৈল, মুদ্রা ইত্যাদি; না হয় এমন হবে, যা ওজন করা যায় না; যথা গোলাম, গৃহ প্রভৃতি। এখন যদি কোন ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে কিছু মাল অর্জন করে এবং জানে যে, সে কোন কোন সামগ্রী বেশী মুনাফায় বিক্রি করতে যেয়ে মিথ্যা বলেছে এবং কিছু মালে সত্য বলেছে, অথবা কোন ব্যক্তি তেল চুরি করে নিজের তেলে মিশ্রিত করে নেয় কিংবা খাদ্য শস্য ও অর্থের বেলায়ও এরূপ হয়, তবে হারাম মাল পৃথক করতে হলে দেখতে হবে, সে হারাম মালের পরিমাণ জানে কি না? যদি পরিমাণ জানা থাকে; যেমন, অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশ, তবে অর্ধেক কিংবা এক তৃতীয়াংশ আলাদা করে নেবে। আর যদি পরিমাণ জানা না থাকে, তবে সন্দেহ ও একীনের মধ্যে একীনের দিকটি অবলম্বন করে সে পরিমাণ মাল আলাদা করবে অথবা প্রবল ধারণা অনুযায়ী কাজ করবে। এর উপায় হল, তার অধিকারে মালের মধ্যে উদাহরণতঃ অর্ধেক হালাল এবং এক তৃতীয়াংশ হারাম। অবশিষ্ট এক ষষ্ঠমাংশের মধ্যে তা হালাল না হারাম সন্দেহ রয়েছে। এখানে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করবে। যদি হালাল বলে প্রবল ধারণা হয়, তবে হালালের মধ্যে রাখবে এবং হারাম বলে প্রবল ধারণা হলে হারামের মধ্যে রাখবে। যদি কোন দিকেই প্রবল ধারণা না হয়; বরং সন্দেহই থেকে যায়, তবে হালালের সাথে রেখে দেয়া জায়েয এবং হারামের সাথে রাখা পরহেযগারী।

নিম্নে উপরোক্ত বর্ণনার পরিপূরক কয়েকটি মাসআলা বর্ণিত হচ্ছে।

(১) এক ব্যক্তি অন্য আরও কয়েক ব্যক্তির সাথে জনৈক মৃত ব্যক্তির

ওয়ারিস। সরকার এই মৃত ব্যক্তির একটি ভূখন্ড বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল, এখন সেই ভূখন্ড ফেরত দিচ্ছে। এটা সকল ওয়ারিসের প্রাপ্য হবে। যদি সরকার এই ভূখণ্ডের অর্ধেক ফেরত দেয় এবং এই ব্যক্তির অংশও অর্ধেক হয়, তবু অন্যান্য ওয়ারিস এই অর্ধেকের মধ্যে তার সাথে শরীক হবে। কেননা, তার অর্ধেক পৃথক নয়। কাজেই বলা যাবে না যে, তার অর্ধেক ফেরত দিয়েছে এবং অন্যদের অংশ বাজেয়াপ্ত রয়ে গেছে। সরকার আলাদার নিয়ত করলেও তা আলাদা হবে না।

(২) এক ব্যক্তির কাছে কোন জালেম শাসনকর্তার দেয়া একটি ভূখণ্ড ছিল। সে তা থেকে কিছু ফসল পেত। এখন সে তওবা করতে চায়। তার উচিত যতদিন এই ভূখণ্ডের ফসল খেয়েছে, আশেপাশের দর অনুযায়ী ততদিনের ভাড়া প্রকৃত মালিককে দিয়ে দেয়া। অন্যায়ভাবে প্রাপ্ত প্রত্যেক মাল থেকে এরূপ মুনাফা অর্জিত হলে তার বিধানও তদ্রূপ। এরূপ না করলে তওবা হবে না। গোলাম, বস্ত্র, তৈজসপত্র ইত্যাদি সাধারণতঃ যে সকল বস্তুর ভাড়া হয় না, সেগুলোর ক্ষেত্রে সাবধানতা হচ্ছে অধিকতর মজুরি ধার্য করে তা মালিককে দিয়ে দেয়া।

(৩) যে ব্যক্তি ওয়ারিসী সম্পত্তি লাভ করে, কিন্তু জানে না মৃত ব্যক্তি হালাল উপায়ে এ সম্পত্তি অর্জন করেছিল না হারাম উপায়ে। হালাল হারাম জানার কোন লক্ষণও নেই। এমতাবস্থায় সকল আলেম একমত যে, এই সম্পত্তি ওয়ারিসের জন্যে হালাল। আর যদি ওয়ারিস নিশ্চিতরূপে জানে যে, এ সম্পত্তিতে হারাম আছে, কিন্তু কি পরিমাণ হারাম, তা সন্দিগ্ধ, তবে অনুমান করে হারাম আলাদা করে দেবে। আর যদি হারাম হওয়ার জ্ঞান না থাকে, কিন্তু মৃত ব্যক্তি জালেম শাসনকর্তার কর্মচারী ছিল বিধায় হারামের সম্ভাবনা আছে, তবে এ সম্পত্তি থেকে বেঁচে থাকা পরহেযগারী– ওয়াজিব নয়। যদি ওয়ারিস জানে যে, মৃত ব্যক্তির কিছু মাল জুলুমের পথে অর্জিত ছিল, তবে সেই পরিমাণ মাল পৃথক করে দেয়া ওয়ারিসের জন্যে অপরিহার্য হবে। কোন কোন আলেম বলেন, বের করা ওয়াজিব হবে না এবং গোনাহ মৃত ব্যক্তির যিম্মায় থাকবে। এর প্রমাণস্বরূপ একটি রেওয়ায়েতপেশ করা হয়। তা হল, বাদশাহের জনৈক কর্মচারী মারা গেলে জনৈক সাহাবী বললেন ঃ এখন তার মাল তার ওয়ারিসদের জন্যে পবিত্র হয়ে গেছে। অবশ্য এ রেওয়ায়েতটি দুর্বল। কারণ, এতে সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবতঃ কোন অসাবধান

সাহাবী বলে থাকবেন। সাহাবীগণের মধ্যে কেউ কেউ কিছুটা অসাবধানও ছিলেন। সম্ভ্রমের খাতিরে আমরা তাঁদের নাম উল্লেখ করছি না। চিন্তার বিষয় হল, যে মালে নিশ্চিতরূপেই হারাম মিশ্রিত থাকে তা অর্জনকারীর মৃত্যুর কারণে বৈধ কিরূপে হয়ে যাবে? হাঁ, ওয়ারিসের জানা না থাকলে বলা যায়, যা সে জানে না, তার শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে না। সুতরাং যে ক্ষেত্রে ওয়ারিস জানে না, এই মালে নিশ্চিতরূপেই হারাম আছে, সেই মাল তার জন্যে পবিত্র বিবেচিত হবে।

হারাম মাল ব্যয় করা ঃ হারাম মাল পৃথক করার পর যদি তার মালিক নির্দিষ্ট থাকে, তবে সেই মাল মালিকের কাছে অথবা তার ওয়ারিসের কাছে অর্পণ করবে। মালিক সেই স্থানে না থাকলে তার জন্যে অপেক্ষা করবে অথবা যেখানে থাকে, সেখানে পৌছে দেবে। এই মালে কিছু বৃদ্ধি ও মুনাফা হলে মালিকের আসা পর্যন্ত তাও জমা রাখবে। আর যদি মালিক নির্দিষ্ট ব্যক্তি না হয় এবং নির্দিষ্ট করারও কোন আশা না থাকে, তবে পরিস্থিতি খুব স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সেই মাল জমা রাখবে। কোন সময় মালিক অনেক হওয়ার কারণে মাল ফেরত দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন, গনীমতের মাল খেয়ানত করার পর যোদ্ধারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। এখন তাদেরকে একত্রিতও করা যায় না। একত্রিত করা গেলেও এক দীনার উদাহরণতঃ দু'হাজার যোদ্ধার মধ্যে কিরূপে বণ্টন করা যাবে? সুতরাং এরূপ মাল সদকা করে দিতে হবে। আর যদি সেই মাল বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত মাল অথবা সরকারী ধনাগারের মাল হয়, যা জনহিতকর কাজের জন্যে হয়ে থাকে, তবে সে মাল পুল, মসজিদ, সরাইখানা এবং মক্কা মোয়াযযমার পথে ঝরণা নির্মাণের কজে ব্যয় করতে হবে, যাতে সে পথে চলাচলকারী মুসলমানরা উপকৃত হয়। এখানে সদকা ও জনহিতকর কাজ করা- এ দুটির দায়িত্ব কাযী তথা বিচারককে দেয়া উচিত। সুতরাং উপরোক্ত হারাম মাল কোন ধার্মিক কাযী পেলে তার হাতে সমর্পণ করবে। যে কাযী হারাম মাল নিজের জন্যে হালাল মনে করে, তার হাতে সমর্পণ করলে মালের ক্ষতিপূরণ সমর্পণকারীর যিম্মায় থাকবে। এমতাবস্থায় কোন ধর্মভীরু আলেমের হাতে সমর্পণ করবে অথবা তাকে কাযীর সাথে সহকর্মী করে দেবে। এসব ব্যবস্থা সম্ভবপর না হলে নিজেই সমস্ত কার্যনির্বাহ করবে। কেননা, উদ্দেশ্য হল ব্যয় করা। তবে অনেকেই জনহিতকর কাজ প্রকৃতপক্ষে

কোনটি তা জানে না বিধায় সাহায্যকারীর প্রয়োজন। সুতরাং উপযুক্ত সাহায্যকারী পাওয়া না গেলে আসল ব্যয় পরিত্যাগ করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে, হারাম বস্তু সদকা করা যে বৈধ তার প্রমাণ কি? মানুষ যে বস্তুর মালিক নয়, তা সদকা করবে কিরূপে? এছাড়া কোন কোন ইমামের মাযহাব অনুযায়ী হারাম মাল সদকা করা জায়েযই নয়। সেমতে ফোযায়ল (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তাঁর হাতে হারাম দু'দেরহাম এসে গেলে তিনি তা পাথরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ আমি পবিত্র মাল ছাড়া অন্য কিছু সদকা করব না। এর জওয়াব হচ্ছে, হারাম মাল সদকা করা যে জায়েয, তার পক্ষে হাদীস, মনীষী বাক্য এবং কিয়াস রয়েছে। হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে একটি ভাজা করা আস্ত ছাগল খাওয়ার জন্যে পেশ করা হলে ছাগলটি অলৌকিকভাবে তাঁকে বলল ঃ আমি হারাম। অতঃপর তিনি সেটি বন্দীদেরকে খাইয়ে দিতে আদেশ করলেন, অর্থাৎ, সদকা করে দিতে বললেন। এছাড়া রোম ও পারস্যের যুদ্ধ সম্পর্কে কোরআন শরীফে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ -

অর্থাৎ,নিকটবর্তী অঞ্চলে রোমকরা পরাজিত হয়েছে। এই পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তারা জয়লাভ করবে।

কাফেররা এর সত্যতা চ্যালেঞ্জ করলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রসূলে করীম (সাঃ)-এর অনুমতিক্রমে কাফেরদের সাথে বাজি ধরলেন। এর পর আল্লাহ তা'আলা যখন কাফেরদের মাথা হেঁট করালেন, তখন হযরত আবু বকর বাজিতে জিতে মাল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির করলেন। তিনি বললেন ঃ এই মাল হারাম। একে খয়রাত করে দাও। মনীষী উক্তি হচ্ছে, হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) একটি বাঁদী ক্রয় করার পর মূল্য পরিশোধ করার সময় বিক্রেতাকে খুঁজে পেলেন না। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হল, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। এর পর তিনি বাঁদীর মূল্য খয়রাত করে দিলেন এবং বললেন ঃ ইলাহী, আমি এটা বাঁদীর মালিকের পক্ষ থেকে দিচ্ছি। সে রাযী হলে ভাল, নতুবা এর সওয়াব আমাকে দিয়ো। হযরত হাসান বসরীকে প্রশ্ন করা হল– এক ব্যক্তি গনীমতের মালে খেয়ানত করল। যোদ্ধারা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল,

সে তওবা করল। সে এই গনীমতের মাল কি করবে? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ খয়রাত করে দেবে। এ সম্পর্কে কিয়াস হচ্ছে, হারাম মাল হয় ধ্বংস করে দিতে হবে, না হয় কোন জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে। কারণ, তার মালিক পাওয়ার আশা নেই। বলাবাহুল্য, সমুদ্রে নিক্ষেপ করার তুলনায় কোন জনহিতকর কাজে ব্যয় করাই উত্তম। কেননা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলে নিজের পক্ষ থেকেও বিনষ্ট হবে এবং মালিকের পক্ষ থেকেও বিনষ্ট হবে। কারই কোন ফায়েদা হবে না, কিন্তু গরীবকে দিয়ে দিলে সে মালিকের জন্যে দোয়া করবে। মালিকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে সদকা করলে সওয়াব হবে না– একথা ঠিক নয়। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে– ক্ষেতের ফসল এবং ফলের বৃক্ষ থেকে যে পরিমাণ মানুষ ও পশুপাখী খায়, সে পরিমাণ সওয়াব চাষী ও বৃক্ষরোপণকারী পায়। বলাবাহুল্য, এটা তাদের ইচ্ছা ছাড়াই পাওয়া যায়। এখন এ প্রসঙ্গে কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) মুহাসেবী (রহঃ) বলেন ঃ কারও হাতে শাসনকর্তার কাছ থেকে কোন মাল পৌঁছলে এই মাল শাসনকর্তাকেই ফিরিয়ে দেবে। কেননা, সে ভাল করেই জানে এটা কাকে দেয়া উচিত। এই ফিরিয়ে দেয়া খয়রাত করার চেয়ে উত্তম। শাসনকর্তার জ্ঞানে হয় তো এই মালের কোন নির্দিষ্ট মালিক আছে। এমতাবস্থায় এটা খয়রাত করা জায়েয হলে কারও কাছ থেকে মাল চুরি করে তা খয়রাত করাও জায়েয হওয়া উচিত। কেউ কেউ বলেন ঃ যদি জানা যায় যে, শাসনকর্তা এই মাল মালিককে ফেরত দেবে না, তবে তা খয়রাত করে দেবে। কেননা, এমতাবস্থায় শাসনকর্তাকে দিলে জুলুমে সাহায্য করা এবং জুলুমের কারণ বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়া মালিকের হকও বরবাদ হবে। কাজেই মালিকের পক্ষ থেকে খয়রাত করে দেয়াই উত্তম।

(২) যখন কোন ব্যক্তির মালিকানায় হালাল, হারাম ও সন্দিগ্ধ মাল থাকে এবং সমগ্র মাল তার প্রয়োজনের বেশী না হয়, তখন সে পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট হলে বিশেষভাবে নিজের জন্যে হালাল মাল আর সন্দিগ্ধ মাল পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করবে। কেননা, মানুষ বিশেষভাবে নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে বেশী। এখানে নিজে হারাম

খেলে তা জেনে শুনে খাওয়া হবে, কিন্তু পরিবার পরিজনরা না জেনে খাবে। কাজেই তাদের ওযর আছে তার ওযর নেই।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি হারাম মাল ফকীরকে খয়রাত করে, তবে অকাতরে দেয়া জায়েয। আর যদি নিজের উপর ব্যয় করে, তবে যথাসম্ভব কম ব্যয় করবে। পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করলে মাঝামাঝি পরিমাণে ব্যয় করবে।

(৪) হারাম মাল পিতামাতার কাছে থাকলে তাদের সাথে খাওয়া ত্যাগ করবে। তারা অসন্তুষ্ট হলেও তাদের কথা মানবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে কোন মানুষের আদেশ পালন করা জায়েয নয়। আর সন্দিগ্ধ মাল হলে তাদের সাথে না খাওয়া পরহেযগারী। এর বিপরীতে পিতামাতার সন্তুষ্টিও পরহেযগারী; বরং ওয়াজিব। কাজেই বিরত থাকলে এমনভাবে বিরত থাকবে যেন তাদের কাছে অসহনীয় না হয়।

(৫) যে ব্যক্তির কাছে হারাম মাল আছে, তার উপর হজ্জ ও যাকাত ফরয হয় না। কেননা, সে নিঃস্ব। আর যদি সন্দিগ্ধ মাল থাকে, যা হালাল হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, তবে হালাল হওয়ার সম্ভাবনার কারণে তার উপর হজ্জ ও যাকাত ফরয হবে।

(৬) যে ব্যক্তির কাছে হারাম মাল আছে এবং সে তা নিজের প্রয়োজনের জন্যে আটকে রেখেছে, সে যদি নফল হজ্জ করতে চায়, তবে পদব্রজে গেলে এই মাল খেতে পারবে। কেননা, হজ্জ ছাড়াও সে এই মাল খেত। সুতরাং হজ্জে খাওয়া আরও ভাল। আর যদি পদব্রজে যেতে সক্ষম না হয় এবং সওয়ারীর মুখাপেক্ষী হয়, তবে এরূপ প্রয়োজনের জন্যে এই মাল ব্যয় করা জায়েয নয়।

(৭) যে ব্যক্তি ফরয হজ্জের জন্য সন্দিগ্ধ মাল নিয়ে রওয়ানা হয়, সে পবিত্র মাল থেকে খাদ্য খাওয়ার চেষ্টা করবে। সারা পথে সম্ভব না হলে এহরাম বাঁধার পর থেকে এহরাম খোলা পর্যন্ত সময়ে পবিত্র খাদ্য খাওয়ার চেষ্টা করবে। যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে কমপক্ষে আরাফার দিনে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া যেন এমতাবস্থায় না হয় যে, খাদ্যও হারাম এবং পরনের পোশাকও হারাম; বরং সেদিন পেটে হারাম

খাদ্য এবং দেহে হারাম পোশাক না রাখার চেষ্টা করবে। কেননা, সন্দিগ্ধ মাল প্রয়োজনের জন্যে জায়েয বলা হলেও এর অর্থ এই নয় যে, তা হালাল হয়ে গেছে। যদি আরাফার দিনেও হালাল খাদ্য ও হালাল পোশাক সম্ভবপর না হয়, তবে মনে মনে ভয় ও দুঃখ করবে যে, যে মাল পাক নয়, তা আমি অপারগ ও অক্ষম অবস্থার কারণেই খাচ্ছি। এতে আশা করা যায়, এই ভয় ও দুঃখের কারণে আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি দেবেন এবং ক্রটি মার্জনা করবেন।

(৮) হযরত ইমাম আহমদ (রহঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ আমার পিতা ধন সম্পদ রেখে মারা গেছেন, কিন্তু তিনি এমন লোকদের সাথে লেনদেন করতেন, যাদের সাথে লেনদেন করা মাকরূহ। এখন আমি কি করব? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা যে পরিমাণ মুনাফা লাভ করেছেন, সেই পরিমাণ মাল বাদ দাও এবং অবশিষ্ট মাল নিজে রেখে দাও। লোকটি আরজ করল ঃ তাঁর কিছু ঋণ অন্যের কাছে এবং অন্য লোকের কিছু ঋণ তাঁর কাছে প্রাপ্য আছে। তিনি বললেন ঃ তাঁর কাছে যার প্রাপ্য আছে তা শোধ কর এবং যা প্রাপ্য আছে, তা আদায় কর। ইমাম আহমদের এই জওয়াব সঠিক। এ থেকে বুঝা যায়, আন্দাজ করে হারাম পরিমাণ বের করে দেয়া তাঁর মতে জায়েয। ধনের ব্যাপারে তিনি এ বিষয়ের উপর ভরসা করেছেন যে, ঋণ নিশ্চিত। সন্দেহের কারণে একে বর্জন করা উচিত নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজকীয় পুরস্কার ও ভাতার বিবরণ

প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি বাদশাহের কাছ থেকে কোন পুরস্কার কিংবা ভাতা গ্রহণ করে, তার দু'টি বিষয় অবশ্যই দেখা উচিত। এক, সেই অর্থ বাদশাহের কাছে আমদানীর কোন্ খাত থেকে এসেছে ? দুই, অর্থ গ্রহণকারীর নিজের যোগ্যতা এবং সেই যোগ্যতা অনুযায়ী কি পরিমাণ পাওয়ার যোগ্য ?

রাজকীয় আমদানীর খাত ঃ চাষাবাদযোগ্য খাস ভূমি ছাড়া যে অর্থ বাদশাহের জন্যে হালাল এবং যাতে প্রজারা অংশীদার, তা দু'প্রকার। প্রথম প্রকার যা কাফেরদের কাছ থেকে হস্তগত হয়; যেমন যুদ্ধলব্ধ মালে গনীমত, যুদ্ধ ছাড়াই প্রাপ্ত মালে ফায় এবং জিযিয়া ও সন্ধির অর্থ, যা শর্তসাপেক্ষ গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় প্রকার যা মুসলমানদের কাছ থেকে হস্তগত হয়, এর মধ্যে কেবল দু'শ্রেণীর মাল বাদশাহের জন্য হালাল– (১) ওয়ারেসীর মাল অথবা সেই মাল, যার কোন ওয়ারিস সাব্যস্ত না হয় এবং (২) ওয়াকফের মাল, যার কোন মুতাওয়াল্লী নেই। এসব খাত ছাড়া যত খরচ ও জরিমানা মুসলমানদের কাছ থেকে নেয়া হয় এবং উৎকোচের অর্থ, সবগুলো হারাম। অতএব যদি বাদশাহ কোন ফেকাহ্‌বিদ প্রমুখের জন্যে কোন জায়গীর কিংবা পুরস্কার কিংবা উপহার দেয়, তবে তা আট অবস্থার বাইরে নয়– হয় জিযিয়ার আমদানী থেকে প্রদান করবে না হয় বেওয়ারিস ওয়ারিসী সম্পত্তি থেকে, ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে, নিজের খাস মালিকানা থেকে, নিজের ক্রয় করা মালিকানা থেকে, মুসলমানদের কাছ থেকে, রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী থেকে, কোন ব্যবসায়ী থেকে অথবা খাস ধনভান্ডার থেকে বরাদ্দ করবে। এখন প্রত্যেকটির অবস্থা শুনা দরকার।

প্রথমঃ জিযিয়া, যার পাঁচ ভাগের চার ভাগ জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হয় এবং একভাগ নির্দিষ্ট খরচের জন্যে রাখা হয়। যদি বাবদশাহ এই এক ভাগ থেকে কিংবা চার ভাগ থেকে দেয় এবং পরিমাণও সাবধানতা সহকারে নির্ধারণ করে, তবে এই অর্থ ফেকাহ্‌বিদ প্রমুখের জন্যে হালাল এই শর্তে যে, মাথাপিছু এক দীনার অথবা চার দীনার

বার্ষিকের চেয়ে বেশী হবে না। কেননা, এর পরিমাণের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। অবশ্য বাদশাহ যে কোন এক উক্তি অনুযায়ী আমল করতে পারে এই শর্তে যে, যে যিম্মীর কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করা হয়, সে যেন কোন নিশ্চিত হারাম পেশায় নিয়োজিত না থাকে।

দ্বিতীয় ঃ ওয়ারিসী মাল ও বেওয়ারিস মাল। এগুলোও জনহিতকর কাজে ব্যয় করার জন্যে। এ ক্ষেত্রে দেখা উচিত, যে ব্যক্তি এই মাল ছেড়ে গেছে, তার সব মাল না কম মাল হারাম ছিল। এর বিধান পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। মাল হারাম না হলে দেখতে হবে যাকে দেয়া হচ্ছে, তাকে দেয়া মঙ্গলজনক কিনা। মঙ্গলজনক হলে কতটুকু মঙ্গলজনক?

তৃতীয় ঃ ওয়াকফের মাল। ওয়ারিসী মালে যে সব বিষয় বিবেচ্য, এখানেও তাই বিবেচ্য। অতিরিক্ত বিষয়, ওয়াকফকারীর শর্তও দেখতে হবে যে, তা লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না।

চতুর্থ ঃ বাদশাহের আবাদ করা ভূমি। এখানে বিবেচ্য বিষয় হল, ভূমি আবাদ করার সময় বাদশাহ মজুরদেরকে মজুরি দিয়েছে কিনা এবং হালাল মাল থেকে দিয়েছে কিনা। বলপূর্বক আবাদ করিয়ে থাকলে বাদশাহ সে ভূমির মালিক হয়নি এবং সেটা হারাম। আর হারাম মাল থেকে মজুরি দিয়ে থাকলে সে ভূমি সন্দিগ্ধ, যার বিধান পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চম ঃ বাদশাহের ক্রয় করা সম্পত্তি। এর মূল্য হারাম মাল দ্বারা পরিশোধ করে থাকলে হারাম এবং সন্দিগ্ধ মাল দ্বারা পরিশোধ করলে সন্দিগ্ধ হবে।

ষষ্ঠ ঃ মুসলমানদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী অথবা যে মালে গনীমত ও জরিমানা একত্রিত করে, তার কাছ থেকে নেয়া। এই মাল নিঃসন্দেহে হারাম। এরূপ মাল থেকে পুরস্কার, ভাতা কিংবা উপহার গ্রহণ করবে না। এ যুগে অধিকাংশ জায়গীর এমনি ধরনের, কিন্তু ইরাকের যমীন এরূপ নয়।

সপ্তম ঃ এরূপ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নেয়া, যে স্বয়ং বাদশাহের সাথে লেনদেন করে, অন্য কারও সাথে করে না। তার মাল রাজকীয় ধনভাণ্ডারের মালের মতই। আর যদি অন্যের সাথে বেশী লেনদেন করে, তবে বাদশাহের লেখা অনুযায়ী যা দেবে, তা বাদশাহের কাছে পাওনা

হবে। এর বিনিময় হারাম দ্বারা শোধ করলে হারাম হবে এবং এর বিধান পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

অষ্টম ঃ খাস ধনভাণ্ডার থেকে নেয়া কিংবা এমন কর্মচারীর কাছ থেকে নেয়া, যার কাছে হালাল ও হারাম উভয়ই সঞ্চিত হয়। বাদশাহের আমদানী হারাম ছাড়া কিছু না থাকলে নিশ্চিত হারাম হবে। যদি নিশ্চিতরূপে জানা থাকে যে, শাহী ধনভাণ্ডারে হারাম হালাল উভয়ই আছে এবং যা দেয়া হচ্ছে তা হালাল কিংবা হারাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে কেউ কেউ বলেন, যে বস্তু নিশ্চিতরূপে হারাম নয়, তা গ্রহণ করা যায়। আবার কেউ কেউ বলেন, হালাল বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা, সন্দেহ কখনও হালাল হয় না। এই উভয় মতই বাড়াবাড়ি। মাঝামাঝি মত তাই, যা আমরা লেখেছি। অর্থাৎ, শাহী মাল অধিকাংশ হারাম হলে গ্রহণ করা হারাম।

শাহী ভাণ্ডারে হালাল হারাম উভয় প্রকার মাল থাকলে এবং যা দেয়া হয়, তার হারাম হওয়া প্রমাণিত না হলে যারা তা গ্রহণ করা জায়েয বলেন, তারা প্রমাণস্বরূপ বলেন, অনেক সাহাবী জালেম বাদশাহদের যমানা দেখেছেন এবং তাদের কাছ থেকে মাল গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবু হোরায়রা, আবু সায়ীদ খুদরী, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত, হযরত আবু আইউব আনসারী, জরীর ইবনে আবদুল্লাহ, আনাস ইবনে মালেক, মেসওয়ার ইবনে মাখরামা, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম। সেমতে হযরত আবু হোরায়রা এবং আবু সায়ীদ (রাঃ) মারওয়ান ইবনে হাকাম ও ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালেকের কাছ থেকে মাল গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাছ থেকে মাল গ্রহণ করেছেন এবং অনেক তাবেয়ীও গ্রহণ করেছেন; যেমন শা'বী, ইবরাহীম, হাসান বসরী ও ইবনে আবী লায়লা। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) হারূন রশীদের কাছ থেকে এক দফায় হাজার দীনার গ্রহণ করেছিলেন এবং ইমাম মালেক (রহঃ) খলীফাগণের কাছ থেকে অনেক ধন-সম্পদ নেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ বাদশাহ্ তোমাকে যা দেয়, তা কবুল কর। সে তোমাকে হালাল থেকেই দেয়। পক্ষান্তরে যাঁরা রাজকীয় দান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, তাঁরা পরহেযগারীর ভিত্তিতেই অস্বীকার করেছেন। তাঁরা আশংকা করেছেন, কোথাও এমন মাল না এসে যায় যা

হালাল নয় এবং দ্বীনদারী বরবাদ করার কারণ হয়ে যায়। হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) আহনাফ ইবনে কায়সকে একবার বললেন ঃ মনের খুশীতে দিলে দান গ্রহণ কর। দান যদি তোমার দ্বীনদারীর বিনিময় হয়ে যায়, তবে তা বর্জন কর। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ কেউ আমাদেরকে কোন দান দিলে আমরা কবুল করে নেই আর না দিলে সওয়াল করি না। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব (রঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) তাঁকে কিছু দিলে তিনি চুপ করে থাকতেন, আর না দিলে কিছুই বলতেন না। হযরত মসরূক (রহঃ) বলেন ঃ সদাসর্বদা দান গ্রহণকারীরা ক্রমান্বয়ে হারাম দান গ্রহণ করতে শুরু করবে। নাফে' হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, মুখতার তাঁর কাছে ধন-দৌলত প্রেরণ করলে তিনি তা কবুল করে নিতেন এবং বলতেন ঃ আমি কারও কাছে সওয়াল করি না এবং আল্লাহ আমাকে যা দেন, তা প্রত্যাখ্যান করি না। নাফে আরও বর্ণনা করেন, ইবনে মুয়াম্মার হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর কাছে ষাট হাজার দেরহাম প্রেরণ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা বিলিয়ে দেন। এর পর জনৈক সওয়ালকারী আগমন করলে তিনি যাদেরকে দিয়েছিলেন, তাদের কাছ থেকে কর্জ করে সওয়ালকারীকে দেন। হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) আমীর মোয়াবিয়ার কাছে গমন করলে আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) বললেন ঃ আমি আপনাকে এমন দান দেব, যা ইতিপূর্বে কোন আরবকে দেইনি এবং ভবিষ্যতেও দেব না। এর পর তিনি চার লক্ষ দেরহাম পেশ করলেন। হযরত ইমাম হাসান তা কবুল করে নিলেন। হাবীব ইবনে আবু সাবেত বর্ণনা করেন, আমি হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে প্রদত্ত মুখতারের উপঢৌকন দেখেছি। তাঁরা উভয়েই সেই উপঢৌকন কবুল করে নেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ সে উপঢৌকন কি ছিল? তিনি বললেন ঃ নগদ অর্থ ও বস্ত্র। হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) এরশাদ করেন, তোমার কোন বন্ধু যদি রাজকর্মচারী কিংবা ব্যবসায়ী হয়– যে সুদ থেকে বেঁচে থাকে না, সে যদি তোমাকে ভোজের দাওয়াত করে অথবা কোন বস্তু দেয়, তবে তা কবুল করে নাও। এটা জায়েয। গোনাহ্ ও শাস্তি তার যিম্মায় থাকবে। সুদ গ্রহীতার ক্ষেত্রে যখন কবুল করা প্রমাণিত হল, তখন জালেমের ক্ষেত্রেও তাই হবে। কেননা, উভয়ের অবস্থা একই রূপ। হযরত ইমাম জাফর সাদেক নিজের পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ইমাম হাসান ও

ইমাম হোসাইন (রাঃ) হযরত আমীর মোয়াবিয়ার উপঢৌকন কবুল করতেন। হাকীম ইবনে জোবায়র (রাঃ) বলেন ঃ আমি হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়র (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন ফোরাতের নিম্নাঞ্চলের ওশর আদায়ের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি আদায়কারীদের কাছে এই বলে লোক পাঠালেন, তোমাদের কাছে যা আছে তা থেকে আমাদেরকে কিছু দাও, খাওয়াও। তারা খাদ্য পাঠিয়ে দিল। তিনি তা খেলেন এবং আমাকেও খাওয়ালেন। হযরত ইবরাহীম নখয়ী বলেন ঃ কাজকর্মচারীদের উপঢৌকন কবুল করায় কোন দোষ নেই। কেননা, তারা শ্রমজীবী। তাদের ধনাগারে ভাল-মন্দ সকল প্রকার মাল থাকে। তারা তোমাকে ভাল মাল থেকেই উপঢৌকন দেবে। দেখ, উপরোল্লিখিত সকলেই জালেম বাদশাহর উপঢৌকন কবুল করেছেন। পূর্ববর্তীদের মধ্যে যারা এই উপঢৌকন কবুল করেননি তাদের কাজ হারাম হওয়ার দলীল নয়; বরং তারা পরহেযগারীর কারণে কবুল করেননি। যেমন, খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত আবু যর গেফারী প্রমুখ পরহেযগারীর কারণে অনেক হালালও গ্রহণ করতেন না। সুতরাং উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের কবুল করা থেকে বুঝা যায়, রাজকীয় ধন-সম্পদ কবুল করা জায়েয। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে কবুল করার তুলনায় কবুল না করা অতি উত্তম। জালেম বাদশাহদের মাল গ্রহণ করা যাদের মতে জায়েয, এ পর্যন্ত তাদের বক্তব্য পেশ করা হল।

এই বক্তব্যের জওয়াব, যাদের কবুল করার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাদেরই কবুল করতে অস্বীকার করা ও ফেরত দেয়ার কথাও বর্ণিত আছে এবং কবুল করার রেওয়ায়েত অপেক্ষা কবুল না করার রেওয়ায়েত অধিক।

জানা উচিত, রাজকীয় ধনসম্পদ পরহেযগারগণের পক্ষে কবুল করা না করার চারটি স্তর আছে। তন্মধ্যে প্রথম স্তর হচ্ছে বাদশাহদের ধনসম্পদ কিছুই কবুল না করা; যেমন পূর্ববর্তী যমানার পরহেযগারগণ করেছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীন করতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বায়তুল মাল থেকে যা কিছু নিয়েছিলেন, সবগুলো হিসাব করে ইন্তেকালের পূর্বে বায়তুল মালে জমা করিয়ে দেন। একবার হযরত ওমর (রাঃ) বায়তুল মালের ধনরাশি বন্টন করছিলেন, এমন সময় তাঁর এক কন্যা এসে একটি দেরহাম তুলে নেয়। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে ধরার জন্যে

এমনভাবে ছুটলেন যে, চাদর এক কাঁধ থেকে পড়ে গেল। কন্যা কাঁদতে কাঁদতে গৃহে চলে গেল এবং দেরহামটি মুখের মধ্যে পুরে নিল। হযরত ওমর (রাঃ) তার মুখে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে দেরহামটি বের করে নিয়ে এলেন এবং যথাস্থানে রেখে বললেন ঃ লোক সকল! এই মাল থেকে ওমর ও তার সন্তানদের ততটুকুই প্রাপ্য, যতটুকু দূরবর্তী ও নিকটবর্তী মুসলমানদের প্রাপ্য। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) একবার বায়তুল মাল ঝাড়ু দিয়ে একটি দেরহাম পান। তিনি সেই দেরহামটি হযরত ওমরের ছোট শিশু পুত্রকে দিয়ে দিলেন। সে সেখানে ঘুরাফেরা করছিল। হযরত ওমর তার হাতে দেরহাম দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোথায় পেলে? পুত্র বলল ঃ আবু মূসা আমাকে দিয়েছেন। তিনি আবু মূসাকে ডেকে এনে বললেন ঃ তোমার জানা মতে মদীনাবাসীদের কোন গৃহ ওমরের গৃহ অপেক্ষা অধিক হেয় ছিল নাকি? তোমার ইচ্ছা, উম্মতে মোহাম্মদীর (সাঃ) এমন কেউ না থাক, যে তার হক আমার কাছে তলব করবে না। এ কথা বলে তিনি দেরহামটি বায়তুল মালে রেখে দিলেন, অথচ সেটা হালাল বৈ ছিল না, কিন্তু তাঁর আশংকা ছিল, হয় তো এতটুকু প্রাপ্য তাঁর হবে না। তিনি দ্বীনদারী ও ইযযত রক্ষার্থে নিজের প্রাপ্যের অপেক্ষা কম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। কেননা, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে রাজকীয় ধনসম্পদ সম্পর্কে অনেক কঠোর বক্তব্য শুনেছিলেন। সেমতে রসূলে করীম (সাঃ) যখন ওবাদা ইবনে সামেতকে যাকাত আদায় করার জন্যে প্রেরণ করেন, তখন বললেন ঃ হে আবুল ওলীদ! আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে। এমন যেন না হয় যে, তুমি কেয়ামতের দিন একটি উষ্ট্রীকে কাঁধে বহন করে আনবে, আর উষ্ট্রী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতে থাকবে অথবা একটি গাভীকে আনবে, যেটি প্রচণ্ড শব্দে হাম্বা রব করতে থাকবে, অথবা একটি ছাগলকে আনবে, সেটি চেঁচাতে থাকবে। ওবাদা আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এরূপই কি হবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, সেই আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ— এরূপই হবে। তবে যার প্রতি আল্লাহ রহম করেন, তার অবস্থা ভিন্ন। ওবাদা আরজ করলেন ঃ যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম, আমি কখনও কোন বস্তুর অসহায় বাহক হব না। রসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেন ঃ তোমরা আমার পরে মুশরিক হয়ে যাবে এ ভয় আমি করি না, কিন্তু আমার আশংকা, তোমরা ধনসম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। এক

হাদীসে বায়তুল মালের অর্থ সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ এই সম্পদের ব্যাপারে আমি নিজেকে এমন উপলব্ধি করি, যেমন এতীমের সম্পত্তির ওলী হয়ে থাকে। প্রয়োজন না হলে আমি এ সম্পদ থেকে দূরে থাকি, আর প্রয়োজন হলে নিতান্ত প্রয়োজন পরিমাণে এ থেকে খাই। বর্ণিত আছে, হযরত তাউসের পুত্র তাঁর পক্ষ থেকে একটি জাল পত্র লেখে খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের কাছে দিলে খলীফা তাকে তিনশ' আশরাফী দিয়ে দিলেন। এই ঘটনা অবগত হয়ে হযরত তাউস নিজের একখণ্ড ভূমি বিক্রয় করে খলীফার কাছে তিনশ' আশরাফী পাঠিয়ে দিলেন। অথচ তিনি ছিলেন খ্যাতনামা ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ। এ স্তরটি পরহেযগারীর শ্রেষ্ঠতম স্তর।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে বাদশাহদের ধনসম্পদ গ্রহণ করা, কিন্তু তখন, যখন জানা যায় যে, যা গ্রহণ করা হচ্ছে তা হালাল পন্থায় অর্জিত। এখানে বাদশাহদের মালিকানায় অন্য হারাম মাল থাকলেও তা ক্ষতিকর হবে না। অধিকাংশ পরহেযগার সাহাবীগণের গ্রহণ করা এই নীতির ভিত্তিতেই ছিল। উদাহরণতঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) অত্যধিক পরহেযগারী করতেন। তিনি না জেনে না শুনে কিরূপে শাহী ধনসম্পদ কবুল করতে পারতেন? তিনি তো বাদশাহদেরকে সর্বাধিক অপছন্দ এবং তাদের ধনসম্পদের সর্বাধিক সমালোচনা করতেন। সেমতে একবার রাজকর্মচারী ইবনে আমেরের কাছে লোকজন সমবেত ছিল। হযরত ইবনে ওমরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইবনে আমের রাজকর্মচারী হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে দণ্ডিত হওয়ার ভয় ব্যক্ত করছিলেন। লোকেরা বলল ঃ আশা করা যায়, আপনি আল্লাহর কাছে দণ্ডিত না হয়ে পুরস্কৃত হবেন। কেননা, আপনি কূপ খনন করিয়েছেন, হাজীদের কাফেলাকে পানি পান করিয়েছেন এবং এই কাজ করেছেন, সেই কাজ করেছেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) চুপচাপ শুনলেন। ইবনে আমের জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ এসব কথা তখন সত্য হবে, যখন উপার্জন ভাল হয় এবং ব্যয়ও সুষ্ঠুভাবে করা হয়। তোমাকে তো ভুগতেই হবে। অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি জওয়াবে বললেন ঃ দূষিত বিষয় গোনাহের বিনিময় হতে পারে না। তুমি বসরার শাসনকর্তা ছিলে। আমার ধারণায় তুমি তাতে পাপই অর্জন করেছ। ইবনে আমের আরজ করলেন ঃ

আপনি আমার জন্যে দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–

لايقبل الله صلوة بغير طهور ولا صدقة من غلول ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ওযু ছাড়া নামায কবুল করেন না এবং খেয়ানতের মাল থেকে সদকা কবুল করেন না।

হযরত ইবনে ওমরের এ উক্তি সেই মালের ব্যাপারে ছিল, যা ইবনে আমের খয়রাতে ব্যয় করেছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আমলে একবার তিনি বললেন ঃ যেদিন থেকে রাজধানী লুণ্ঠিত হয়েছে, আমি পেট ভরে আহার করিনি। একবার ইবনে আমের হযরত ইবনে ওমরের গোলাম নাফে'কে ত্রিশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে চাইলে তিনি বললেন ঃ আমার আশংকা, ইবনে আমেরের দেরহাম আমাকে ফেতনায় না ফেলে দেয়। এই বলে তিনি নাফে'কে মুক্ত করে দিলেন। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে দুনিয়া আকৃষ্ট করেনি– হযরত ইবনে ওমর ছাড়া। তাঁকে দুনিয়া আকৃষ্ট করতে পারেনি। এ থেকে বুঝা যায়, হযরত ইবনে ওমরের মত ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ ধারণা হতে পারে না যে, তিনি হালাল না জেনেই কোন মাল কবুল করে থাকবেন।

তৃতীয় স্তর হচ্ছে বাদশাহের কাছ থেকে যা গ্রহণ করা হয়, তা ফকীর ও হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া। যে মালের কোন নির্দিষ্ট মালিক নেই, শরীয়তে তার বিধান এরূপই। বাদশাহ যদি এমন হয় যে, তার কাছ থেকে না নেয়া হলে সে নিজে বণ্টন করবে না; বরং তা জুলুমের সহায়তায় ব্যয় করবে, তবে তার কাছে মাল রেখে দেয়ার চেয়ে গ্রহণ করে বণ্টন করে দেয়া উত্তম। কোন কোন আলেমের অভিমত তাই। অধিকাংশ পূর্ববর্তীগণ এই প্রকারেই বাদশাহদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করতেন। এই জন্যেই হযরত ইবনে মোবারক বলেন ঃ আজ যারা শাহী দান গ্রহণ করে এবং হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করে, তারা তাঁদের অনুসরণ করে না। কেননা, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যা কিছু গ্রহণ করেছেন তা সবই বণ্টন করে দিয়েছেন। এমন কি ষাট হাজার দেরহাম বণ্টন করার পরও অন্য একজন

সওয়ালকারীর জন্যে মজলিস থেকেই কর্জ করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-ও তাই করেছেন। জাবের ইবনে যায়েদও গ্রহণ করে তা খয়রাত করে দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ বাদশাহদের কাছ থেকে গ্রহণ করে বণ্টন করে দেয়া তাদের কাছে থাকতে দেয়ার তুলনায় আমার কাছে ভাল মনে হয়। ইমাম শাফেয়ী হারূন রশীদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছিলেন, তাও কয়েক দিনের মধ্যেই খয়রাত করে দিয়েছিলেন, নিজের জন্যে একটি দানাও রাখেননি।

চতুর্থ স্তর হচ্ছে, মাল হালাল হওয়ার প্রমাণ নেই, তা বণ্টনের উদ্দেশে নয়; বরং নিজের ভোগ করার জন্যে গ্রহণ করা, কিন্তু এমন বাদশাহর কাছে থেকে গ্রহণ করা, যার অধিকাংশ মাল হালাল। চার জন খোলাফায়ে রাশেদীনের পরও সাহাবী ও তাবে তাবেয়ীগণের যুগের খলীফাগণ এরূপই ছিলেন। তাদের অধিকাংশ মাল হারাম ছিল না। এর দলীল হযরত আলী (রাঃ)-এর এরশাদ– বাদশাহ হালাল পন্থায় যে মাল প্রাপ্ত হয় তাই বেশী। এই চতুর্থ স্তরকে একদল আলেম জায়েয বলেছেন। আমরা নিষেধ তখন করি, যখন হারামের অংশ বেশী বলে অনুমিত হয়।

উপরোক্ত স্তরসূহ হৃদয়ঙ্গম করার পর একথা বুঝা সহজ যে, এ যুগের জালেম বাদশাহদের জায়গীর ও ভাতা তেমন নয়, যেমন পূর্বে ছিল। কেননা, এ যুগের বাদশাহদের মাল সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ হারাম। হালাল ছিল কেবল যাকাত, ফায় ও গনীমতের খাত। এ যুগে এগুলোর অস্তিত্ব নেই। এখন বাকী রয়েছে জিযিয়া, যা জুলুমের মাধ্যমে আদায় করা হয়। ফলে তা গ্রহণ করা হালাল নয়। এছাড়া পূর্বেকার জালেম বাদশাহরা সাহাবী ও তাবেয়ীদের যমানার নিকটবর্তী ছিল বিধায় জুলুম সম্পর্কে অধিক সচেতন ছিল। তারা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সন্তুষ্টিতে আগ্রহী ছিল। তারা চাওয়া ছাড়াই উপঢৌকন ইত্যাদি তাঁদের খেদমতে পাঠিয়ে দিত এবং কবুল করলে নিজেদেরকে ধন্য মনে করত। তাঁরা বাদশাহদের কাছ থেকে নিয়ে ফকীরদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। ফলে তাঁদের ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না, কিন্তু বর্তমানে অবস্থা হচ্ছে, শাসকদের মন তাকেই কিছু দিতে চায়, যে তাদের খেদমত করতে পারে, দল বৃদ্ধি করতে পারে, সাহায্য করতে পারে, দরবারে শরীক হয়ে সৌন্দর্য বর্ধন করতে পারে, দোয়া করতে পারে, সদাসর্বদা স্তুতি বাক্য পাঠ করতে

পারে এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রশংসা করতে পারে। আর যারা এসব যিল্লতী সম্পাদন করতে সম্মত নয় তাদের সম্পর্কে নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে, শাসকরা তাদেরকে একটি পয়সাও দেবে না, যদিও সমসাময়িক ইমাম উদাহরণতঃ ইমাম শাফেয়ীই হয়। এসব কারণে বর্তমান যুগের শাসকদের কাছ থেকে হালাল মাল হলেও নেয়া জায়েয নয়। আর হারাম অথবা সন্দিগ্ধ মাল হলে তো নিঃসন্দেহেই নেয়া জায়েয নয়। এখন যে কেউ শাসকদের মাল গ্রহণ করে এবং নিজেকে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সাথে তুলনা করে, সে কর্মকারকে ফেরেশতাদের সাথে তুলনা করে। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, বাদশাহদের আমদানীর খাতসমূহের মধ্যে কোন্‌টি হালাল ও কোন্‌টি হারাম। এখন যদি কোন ব্যক্তি হালাল খাত থেকে তার হক পরিমাণে ঘরে বসে পায়, কারও তোষামোদ ও খেদমত করার প্রয়োজন না হয়, বাদশাহদের প্রশংসা করতে না হয় এবং তাদের মতলবে একমত হতে না হয় তবে সেই মাল গ্রহণ করা হারাম হবে না, কিন্তু কয়েক কারণে মাকরূহ হবে, যা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে।

পরিমাণ ও গুণ ঃ কতক মালের প্রাপক নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, ওয়াকফের মাল, যাকাতের মাল, ফায়-এর এক পঞ্চমাংশ ও গনীমতের এক পঞ্চমাংশ। কতক মালের মালিক স্বয়ং বাদশাহ, যেমন তার চাষযোগ্য ভূমি অথবা তার ক্রীত সম্পত্তি। বাদশাহের মালিকানাধীন এসব সম্পদ থেকে যাকে ইচ্ছা, যে পরিমাণ ইচ্ছা দিতে পারে। তাই আমরা সে সব সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করব, যেগুলো জনহিতকর কাজের জন্যে নির্দিষ্ট। যেমন ফায়-এর চার-পঞ্চমাংশ এবং বেওয়ারিস ত্যাজ্য সম্পত্তি। এসব সম্পদ তাদেরকেই দেয়া উচিত, যাদেরকে দিলে জনগণের কল্যাণ হয় অথবা যে ব্যক্তি উপার্জন করতে অক্ষম। যে ব্যক্তি ধনী এবং যাকে দিলে জনগণের কোন কল্যাণ হয় না, বায়তুল মালের অর্থ তাকে না দেয়া উচিত। এতে আলেমগণের মতভেদ থাকলেও না দেয়াটাই বিশুদ্ধ। হযরত ওমর (রাঃ)-এর উক্তি থেকে বুঝা যায়, বায়তুল মালের অর্থে প্রত্যক মুসলমানের অধিকার রয়েছে মুসলমান হওয়ার কারণে। এতদসত্ত্বেও তিনি সকল মুসলমানের মধ্যে অর্থ বন্টন করতেন না; বরং তাদেরকেই দিতেন, যার উপকার মুসলমানরা পায় এবং যে এই কাজ না

করে উপার্জনে মশগুল হলে সে কাজ হতে পারে না, এরূপ ব্যক্তির হক প্রয়োজন পরিমাণে বায়তুল মালে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ নীতি অনুযায়ী প্রয়োজন পরিমাণে বায়তুল মালে হক রয়েছে। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য এমন আলেম, যাদের দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ সাধিত হয়। যেমন, ফেকাহ্, হাদীস ও তফসীরের আলেম এবং এগুলোর শিক্ষক ও তালেবে এলেম। কেননা, তারা প্রয়োজন পরিমাণে না পেলে এলেম অর্জন করতে পারবে না। সে সব কর্মচারীও এর অন্তর্ভুক্ত, যাদের কর্ম দুনিয়ার উপকারের সাথে জড়িত। যেমন, সেনাবাহিনীর লোকজন, যারা দেশের সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী। দেশের চিকিৎসকগণও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদের এবং এ ধরনের অন্যান্য আলেমগণের ভাতা বায়তুল মাল থেকে দেয়া উচিত, যাতে কেউ পারিশ্রমিক ছাড়া চিকিৎসা করাতে চাইলে তাদের দ্বারা করাতে পারে। তাঁদের মধ্যে প্রয়োজন থাকা শর্ত নয়; বরং ধনী হলেও তাঁদেরকে ভাতা দিতেন, অথচ তাঁদের সকলের প্রয়োজন ছিল না। ভাতার পরিমাণও নির্দিষ্ট নয়; বরং শাসনকর্তার অভিমতের উপর নির্ভরশীল। তিনি যাকে ইচ্ছা ততটুকু দিতে পারবেন, যদ্দ্বারা ধনী হয়ে যায় এবং যাকে ইচ্ছা প্রয়োজন পরিমাণে দিতে পারবেন। সাময়িক উপযোগিতা ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী এরূপ করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। সেমতে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) আমীর মোয়াবিয়ার কাছ থেকে এক দফায় চার লাখ দেরহাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) কিছুসংখ্যক লোককে বার্ষিক বার হাজার দেরহাম দিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নাম এই তালিকারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি কিছু লোককে দশ হাজার এবং কিছু লোককে ছয় হাজার দেরহাম করেও দিতেন।

সারকথা, বায়তুল মাল উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের হক এবং তাদের মধ্যে বিনাদ্বিধায় বণ্টন করা উচিত। অনুরূপভাবে এই মাল থেকে বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে উপঢৌকন ও পুরস্কার দ্বারা ভূষিত করার ক্ষমতাও বাদশাহের আছে, কিন্তু এতে উপযোগিতার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। যখন কোন বিজ্ঞ ও বীর পুরুষকে পুরস্কৃত করা হবে, তখন অন্যরাও অনুপ্রাণিত হবে এবং অনুরূপ কাজ করতে আগ্রহী হবে। এসব বিষয় বাদশাহের ইজতিহাদের সাথে জড়িত।

জালেম বাদশাহদের ব্যাপারে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথমতঃ জালেম শাসক শাসন ক্ষমতা থেকে পদচ্যুত হওয়ার যোগ্য। সে হয় পদত্যাগ করবে না হয় তাকে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় সে যখন প্রকৃতপক্ষে শাসকই নয়, তখন তার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করা কিরূপে দুরস্ত হবে? দ্বিতীয়ত জালেম শাসক তার অর্থ সকল হকদারকে দেয় না। এমতাবস্থায় তার কাছ থেকে দু'একজন কিরূপে নিতে পারে? এর পর কথা হল, দু'একজন তাদের অংশ পরিমাণে নিলে দুরস্ত হবে কিনা? না মোটেই না নেয়া অথবা যা-ই পাওয়া যায় তা-ই নেয়া জায়েয। প্রথম অবস্থায় আমাদের অভিমত হচ্ছে, কেউ আপন অংশ পরিমাণে নিলে তাকে নিষেধ করা যাবে না। কেননা, জালেম শাসক শক্তিমান হলে তাকে বরখাস্ত করা কঠিন হয়ে থাকে এবং অন্যকে তার স্থলাভিষিক্ত করলে অসহনীয় ফাসাদ দেখা দেয়। ফলে জালেম শাসককেই থাকতে দেয়া এবং তার আনুগত্য করা জরুরী হয়ে যায়। আজকাল তো 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিই কার্যকর। জোরওয়ালারা যার বয়াত করে নেয় সেই খলীফা। অতএব যা পাওয়া যায় তাই নেয়া কেয়াসসম্মত। অবশিষ্ট যারা না পায় তাদের প্রতি জুলুম থেকে যাবে।
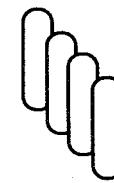
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জালেম শাসকের সাথে মে'লামেশার স্তর

প্রকাশ থাকে যে, জালেম শাসকদের সাথে তিন প্রকার অবস্থা হতে পারে। এক, তাদের কাছে যাওয়া। এটা কম মন্দ অবস্থা। দুই, জালেম শাসকদের তোমার কাছে আসা। এটা অপেক্ষাকৃত কম মন্দ অবস্থা। তিন, তাদের থেকে সম্পূর্ণ সরে থাকা। যেমন, তুমিও তাদেরকে দেখবে না এবং তারাও তোমাকে দেখবে না। এটা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত অবস্থা। এখন প্রত্যেক অবস্থার গুণাগুণ আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হচ্ছে।

জালেম শাসকদের কাছে যাওয়া ঃ এ সম্পর্কে হাদীসে অনেক কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে বিষয়টি যে কত নিন্দনীয়, নিম্নোদ্ধৃত বাণীসমূহ থেকে তা সহজেই বুঝা যাবে। রসূলে করীম (সাঃ) জালেম শাসকদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

فمن نابدهم نجا ومن اعتزلهم سلم او كاد ان يسلم ومن وقع معهم فى دنياهم فهم منهم .

অর্থাৎ, যে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে সে মুক্তি পাবে। যে তাদের থেকে পৃথক থাকবে সে নিরাপদ থাকবে অথবা নিরাপত্তার নিকটবর্তী বলে গণ্য হবে। আর যে তাদের সাথে তাদের দুনিয়াতে লিপ্ত হবে, সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে।

উদ্দেশ্য, যে তাদের থেকে সরে থাকবে, সে তাদের গোনাহ থেকে নিরাপদ থাকবে, কিন্তু তাদের উপর আযাব নাযিল হলে সে আযাব থেকে অব্যাহতি পাবে না। কারণ, সে প্রতিবাদ করেনি এবং সৎকাজের আদেশ বর্জন করেছে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– আমার পরে এমন শাসক হবে, যারা মিথ্যা বলবে এবং জুলুম করবে। অতএব যে ব্যক্তি তাদের মিথ্যাকে সত্য বলবে এবং তাদের জুলুমে সহায়তা করবে, সে আমা থেকে মুক্ত এবং আমি তার থেকে মুক্ত। সে আমার হাউজে অবতীর্ণ হবে না। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ابغض القراء الى الله تعالى يزورون الامراء .

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত সে সকল ক্বারী, যারা শাসকদের দরবারে গিয়ে উপনীত হয়।

এক হাদীসে আছে– শাসকদের মধ্যে উত্তম তারা, যারা আলেমগণের নিকট যায়। আর আলেমগণের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা যারা শাসকদের কাছে যায়। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ

العلماء امناء الرسل على عباد الله ما ليخالطوا السلطان فاذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم .

অর্থাৎ, আলেমগণ আল্লাহর বান্দাদের উপর রসূলগণের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি, যে পর্যন্ত তারা শাসকবর্গের সাথে মেলামেশা না করে। যদি তারা এরূপ করে, তবে রসূলগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তোমরা এ ধরনের আলেম থেকে হুঁশিয়ার থাক এবং দূরে সরে থাক।

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট জ্ঞানীগণের উক্তি নিম্নরূপ ঃ

হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ ফেতনার জায়গা থেকে দূরে থাক। প্রশ্ন করা হল ঃ ফেতনার জায়গা কি? তিনি বললেন ঃ শাসকবর্গের দরজা। তোমাদের কেউ শাসকবর্গের কাছে গেলে মিথ্যা কথায় তাদেরকে সত্যবাদী বলে এবং যে গুণ তাদের মধ্যে নেই তা বর্ণনা করে।

হযরত আবু যর (রাঃ) সালামাকে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে বললেন ঃ হে সালামা! বাদশাহদের দরজায় যেয়ো না, গেলে তুমি তাদের দুনিয়া থেকে যা পাবে, তার চেয়ে উত্তম বস্তু তারা তোমার দ্বীন থেকে নিয়ে নেবে। হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ দোযখে একটি উপত্যকা আছে, যাতে কেবল সেই কারীদের স্থান হবে, যারা বাদশাহদের কাছে যাতায়াত করে। আওযায়ী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে সেই আলেমের চেয়ে মন্দ কেউ নয়, যে কোন রাজকর্মচারীর নিকট স্বার্থোদ্ধারের লক্ষ্যে যাতায়াত করে। সমনূন (রহঃ) বলেন ঃ আলেমের জন্যে এটা খুব মন্দ ব্যাপার যে, তার মজলিসে এসে তাকে না পেয়ে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে– তিনি কোথায় আছেন? তখন জওয়াবে বলা হয়– তিনি শাসকের কাছে আছেন। যদি কোন আলেমকে দুনিয়ার সাথে

মহব্বত রাখতে দেখ, তবে তাকে দ্বীনদারীতে দোষী মনে করবে। আমি এই নীতিবাক্য আগে শুনতাম, কিন্তু এখন নিজে তা পরীক্ষা করে নিয়েছি। অর্থাৎ, আমি যখন বাদশাহের কাছে গেছি, তখন তাদের দরবার থেকে বের হওয়ার পর আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে দুনিয়ার প্রতি মোহ অনুভব করেছি। অথচ আমি বাদশাহের সাথে কঠোর ভাষায় কথা বলি এবং তার খেয়াল-খুশীর সমর্থন করি না।

হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন ঃ কারী আবেদ যদি শাসকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তবে তা হয় মোনাফেকী, আর যদি ধনীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তবে তা হয় রিয়া। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ে ভিড় বৃদ্ধি করে, তাকে তাদের মধ্যেই গণ্য করা হয়। এর অর্থ জালেমদের দল বৃদ্ধি করলে তাকে জালেমই বলা হবে। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন বাদশাহের কাছে যায়, তখন তার দ্বীন তার কাছেই থাকে, কিন্তু যখন সেখান থেকে ফিরে আসে, তখন দ্বীন বিদায় হয়ে যায়। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন ঃ সে বাদশাহকে এমন কথা বলে সন্তুষ্ট করে, যে কথার কারণে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করার পর জানতে পারলেন, সে এক সময় হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কর্মচারী ছিল। তিনি কালবিলম্ব না করে তাকে বরখাস্ত করলেন। লোকটি আরজ করল ঃ আমি তো তার আমলে অল্প কয়েক দিন কাজ করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ তার সংসর্গে একদিন অথবা কয়েক মুহূর্ত থাকাই অকল্যাণ ও অনর্থ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিল। হযরত ফোযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ মানুষ যতই শাসকদের নৈকট্যশীল হয়, ততই আল্লাহ থেকে দূরে সরে পড়ে। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব তেলের ব্যবসা করতেন এবং বলতেন ঃ এই ব্যবসার কারণে শাসকদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। ওহায়ব (রহঃ) বলেন ঃ যেসব মানুষ বাদশাহদের কাছে যায় তারা উম্মতের জন্যে জুয়াড়ীদের চেয়েও অধিক ক্ষতিকর। যুবায়রী (রহঃ) যখন বাদশাহের সাথে মেলামেশা শুরু করলেন, তখন তাঁর জনৈক ধর্মীয় ভাই তাঁর কাছে এই মর্মে পত্র লেখলেন ঃ হে আবু বকর! আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও তোমাকে ফেতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। তোমার অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তোমার জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে রহমতের দোয়া করা

তোমার পরিচিত জনের কর্তব্য হয়ে পড়েছে। তুমি বড় প্রবীণ। আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত তোমার ওজনও বৃদ্ধি করে দিয়েছে। তিনি তাঁর কিতাবের জ্ঞান তোমাকে দান করেছেন এবং তাঁর রসূলের সুন্নত শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আলেমগণের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُوْنَهٗ ـ

অর্থাৎ, স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আল্লাহ কিতাবপ্রাপ্তদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, তোমরা লোকদের কাছে অবশ্যই এই কিতাব বর্ণনা করবে এবং একে গোপন করবে না।

মনে রেখো, যে কাজ তুমি করছ, তার সামান্যতম অনিষ্ট এই যে, তুমি জালেমের ভীতি দূর করে দিয়েছ। আপন সান্নিধ্য দ্বারা সে ব্যক্তির সামনে ভ্রষ্টতার পথ সহজ করে দিয়েছ, যে কোন হক আদায় করেনি এবং কোন কুকর্ম বর্জন করেনি। জালেমরা তোমাকে নৈকট্যশীল করে আপন জুলুমের কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছে, যাতে তাদের জুলুমের যাঁতাকল তোমার চারপাশে ঘুরে। তুমি তাদের জন্যে সেতু হয়ে গেছ, যাতে বিপদে তোমার উপর দিয়ে পার হওয়া যায়। তুমি তাদের ভ্রষ্টতার স্তর অতিক্রম করার জন্যে সিঁড়ির মত ব্যবহৃত হচ্ছ। তোমার কারণে তারা আলেমদের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করবে এবং মূর্খদের মন নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে। অতএব তারা যতটুকু তোমার নষ্ট করেছে, তার মোকাবিলায় তোমার ফায়দা নগণ্য। তুমি কি এই আয়াতের প্রতীক হতে ভয় কর না যে, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ الخ অতঃপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল অযোগ্যরা, যারা নামায বিনষ্ট করল! মনে রেখো, তোমার লেনদেন এমন এক সত্তার সাথে, যিনি তোমার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত নন এবং তোমার ক্রিয়াকর্ম থেকে গাফেলও নন। এখন তুমি তোমার রুগ্ন দ্বীনদারীর চিকিৎসা কর এবং পাথেয় প্রস্তুত কর। কারণ, সফর দূরদূরান্তের এবং আল্লাহ তাআলার কাছে কোন বিষয় পৃথিবীতে ও আকাশে গোপন নয়। ওয়াস সালাম।

এসব হাদীস ও জ্ঞানীগণের উক্তি থেকে জানা যায়, বাদশাহদের সাথে মেলামেশায় কি ধরনের ফেতনা ফাসাদ বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু

নিম্নে আমরা ফেকাহর দৃষ্টিকোণ থেকে এসবের বিবরণ পেশ করব; যদ্দ্বারা বুঝা যাবে যে, এই মেলামেশার মধ্যে কোন্‌টি হারাম, কোনটি মাকরূহ ও কোন্‌টি বৈধ?

যে ব্যক্তি বাদশাহের কাছে যায়, সে নিজের কর্মের দ্বারা, মৌন সম্মতির দ্বারা, কথাবার্তার দ্বারা অথবা বিশ্বাস দ্বারা আল্লাহ তাআলার নাফরমানীর সম্মুখীন হয়। কর্ম দ্বারা নাফরমানী এভাবে যে, বাদশাহের কাছে যাওয়া অধিকাংশ অবস্থায় জবরদখলকৃত ঘরে প্রবেশের মত হয়ে থাকে। কেননা, অধিকাংশ ক্ষমতার মসনদই তো জোরপূর্বক দখলকৃত। জবরদখল করা কোন ঘরে প্রবেশ করা তো নিঃসন্দেহে হারাম। এখানে যদি বলা হয়, এটা হালকা বিষয়, যা মানুষ সাধারণতঃ মার্জনা করে থাকে; যেমন খোরমা অথবা একখণ্ড রুটি তুলে নিলে কেউ আপত্তি করে না, তবে তাতে ধোঁকা খাওয়া উচিত নয়– এমন বস্তুর মধ্যে মার্জনা হয়ে থাকে। জবরদখলকৃত বস্তুতে সাধারণতঃ মার্জনা হয় না। আর যদি জালেম নিজের মালিকানাধীন জায়গায় থাকে, তবুও তার কাছে যাওয়া হারাম। কেননা, তার জায়গা হারাম উপায়ে অর্জিত। যদি ধরে নেয়া যায়, তার জায়গা তাঁবু ইত্যাদি হালাল মাল দ্বারা অর্জিত, তবে এমতাবস্থায় কেবল সম্মুখে যাওয়া এবং আসসালামু আলাইকুম বলা পর্যন্ত গোনাহগার হবে না, কিন্তু যদি জালেমকে তোয়াজ করা হয় অথবা তার সামনে নত হয়, তবে তাতে নিঃসন্দেহে গোনাহ্‌ হবে।

মৌন সম্মতি দ্বারা নাফরমানী এভাবে হয় যে, যে জালেম বাদশাহের দরবারে যাবে, সে রেশমী ফরশ, সোনার পাত্র, বাদশাহ এবং বাদশাহের গোলামদের রেশমী বস্ত্র ইত্যাদি হারাম বস্তু সামগ্রী দেখবে। গোনাহের বস্তু সামগ্রী দেখে যে চুপ থাকে, সে সেই গোনাহে শরীক হয়ে যায়। এছাড়া তাদের অশ্লীল কথাবার্তা, মিথ্যা ভাষণ, গালি-গালাজ, পীড়াদায়ক উক্তি, গীবত ইত্যাদি হারাম বিষয়াদি শুনে চুপ থাকা হারাম। সে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার ওয়াজিব কর্তব্য পালন করতে অক্ষম হয়ে চুপ করে থাকে। এটা গোনাহ। যদি বলা হয়, সে ভয়ে কিছু বলে না, তাই এটা ওযর, তবে জওয়াব, তার সেখানে যাওয়ারই কি প্রয়োজন ছিল? অবৈধ কাজ করার প্রয়োজন কেবল শরীয়তসম্মত ওযর দ্বারা হতে পারে। অতএব সে সেখানে না গেলে এবং সেগুলো না দেখলে অসৎ কাজে নিষেধ করাও তার কর্তব্য হত না। সুতরাং উপরোক্ত ওযর

গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই আমরা বলি, যে ব্যক্তি জানে যে, অমুক জায়গায় অনাচার হচ্ছে যা দূর করা সম্ভবপর নয়, সেখানে তার যাওয়া জায়েয নয়। কারণ, সেখানে গেলে অনাচার দেখেও চুপ করে থাকতে হবে। কাজেই দেখা থেকেই বিরত থাকা উচিত।

জালেম বাদশাহের জন্যে এরূপ দোয়া করা জায়েয ঃ আল্লাহ আপনাকে পুণ্য দান করুন, অথবা আল্লাহ আপনাকে সৎ কাজের তওফীক দান করুন অথবা আল্লাহ পাক তাঁর আনুগত্যে আপনার হায়াত দরাজ করুন। অথবা এমনি ধরনের দোয়া করবে, কিন্তু প্রভু বলে দীর্ঘায়ু ও সমস্ত নেয়ামত পূর্ণ করার দোয়া করা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে তার মুখ থেকে কোন ভ্রান্ত কথা বের হলেও এরূপ বলা জায়েয নয় যে, হুযর (সাঃ) যথার্থই এরশাদ করেছেন। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ

من دعا لظالم بالبقاء احب ان يعص الله في ارضه ـ

অর্থাৎ, যেব্যক্তি জালেমের জন্যে দীর্ঘায়ুর দোয়া করে, সে চায়, আল্লাহর দুনিয়াতে আল্লাহর নাফরমানী অব্যাহত থাকুক।

এমনিভাবে অতিরঞ্জিত দোয়া করা ও তার প্রশংসা বর্ণনা করা জায়েয নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ পাপাচারীর প্রশংসা করা হলে আল্লাহ তাআলা ক্রুদ্ধ হন। এক হাদীসে আছে–

من اكرم فاسقا فقد اعان على هدم الاسلام ـ

অর্থাৎ, যে ফাসেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, সে ইসলামকে বিধ্বস্ত করতে সহায়তা করে।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ এক জালেম জনশূন্য জঙ্গলে মরতে থাকলে তাকে পানি পান করানো উচিত কিনা? তিনি বললেন ঃ না; তাকে মরতে দেয়া উচিত। পান পানি করানো তাকে জুলুমে সাহায্য করার নামান্তর। অন্যেরা এ বিষয়ে বলেন, তাকে পানি এতটুকু পান করানো উচিত, যাতে তার দেহে প্রাণ ফিরে আসে।

যেব্যক্তি জালেমকে ভালবাসে, সে যদি জুলুমের কারণে ভালবাসে তবে গোনাহগার হবে। আর যদি অন্য কোন কারণে ভালবাসে, তবে ওয়াজিব তরক করার কারণে পাপী হবে। ওয়াজিব ছিল জালেমের সাথে শত্রুতা পোষণ করা। সে উল্টা ভালবাসলো। এক ব্যক্তির মধ্যে দু'টি

অথবা তিনটি কল্যাণ ও অনিষ্টের বিষয় একত্রিত অবস্থায় পাওয়া গেলে কল্যাণকর বিষয়ের কারণে তাকে ভালবাসা এবং অনিষ্টকর বিষয়ের কারণে তার সাথে শত্রুতা রাখা উচিত। শত্রুতা ও ভালবাসা কিরূপে একত্রিত হতে পারে, তা পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হবে।

মোট কথা, দু'টি ওযর ছাড়া বাদশাহদের কাছে যাওয়া জায়েয নয়– এক তাদের কাছ থেকে হাযির হওয়ার পরওয়ানা জারি হলে যাবে এবং দুই, কোন মুসলমান ভাইয়ের উপর থেকে জুলুম দূর করার জন্যে অথবা নিজের উপর জুলুম না হওয়ার নিয়তে যাবে। এসব ওযরের কারণে যাওয়ার অনুমতি আছে, কিন্তু শর্ত, মিথ্যা বলবে না এবং প্রশংসা করবে না।

বাদশাহের স্বয়ং কারও কাছে আসা ঃ যদি স্বয়ং জালেম বাদশাহ তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে, তবে সালামের জওয়াব দেয়া জরুরী এবং তার সম্মানে দাঁড়ানোও হারাম নয়। কেননা, এলেম ও দ্বীনের সম্মান করার কারণে সে সম্মান পাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। সুতরাং সম্মানের বদলে সম্মান করা এবং সালামের বদলে জওয়াব দেয়া উচিত, কিন্তু একান্তে আগমন করলে তার সম্মানে না দাঁড়ানোই উত্তম, যাতে দ্বীনের ইযযত তার কাছে জাহির হয়, জুলুম তার দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হয় এবং সে জানতে পারে যে, আল্লাহ যার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তাঁর বিশিষ্ট বান্দারাও সেব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। যদি জনসমাবেশে মিলিত হবার জন্য আসে, তবে প্রজাদের সন্মুখে বাদশাহর প্রতি সম্মান দেখানো জরুরী। সুতরাং এই নিয়তে দণ্ডায়মান হলে কোন দোষ নেই। এর পর সাক্ষাতের সুযোগে বাদশাহকে উপদেশ দেয়া ওয়াজিব। যদি সে এমন হারাম কাজ করে, যা হারাম বলে সে জানে না এবং জানিয়ে দিলে সে কোজটি বর্জন করবে বলে আশা করা যায়, তবে সে কাজটি যে হারাম, তা বলে দেয়া ওয়াজিব। আর যেসব বিষয় হারাম বলে সে নিজে জানে; যেমন মদ্যপান, জুলুম করা, সেগুলো উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। মোট কথা, যদি তোমার বিশ্বাস থাকে যে, তোমার উপদেশ বাদশাহের মধ্যে কার্যকর হবে, তবে তিনটি বিষয় তোমার উপর ওয়াজিব। এক, যে বিষয় বাদশাহ জানে না তা তাকে বলে দেবে। দুই, সে জেনেশুনে যেসব কাজ করে, তার জন্যে তাকে সতর্ক করবে। তিন, যে বিষয়ে সে গাফেল সেদিকে তাকে পথ প্রদর্শন করবে।

মুহাম্মদ ইবনে সালেহ বলেন ঃ আমি হাম্মাদ ইবনে সালমার কাছে

উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, তাঁর গৃহে চারটি বস্তু ছাড়া কিছুই নেই। (১) তাঁর বসার চাটাই, (২) তেলাওয়াতের জন্যে একখানি কোরআন শরীফ, (৩) কিতাবের একটি বস্তা এবং (৪) ওযুর লোটা। একদিন যখন আমি তাঁর কাছে ছিলাম, হঠাৎ দরজায় কেউ কড়া নাড়ল। জানা গেল, শাসক মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান আগমন করেছে। তিনি অনুমতি দিয়ে সে ভিতরে এসে সম্মুখে বসে গেল। সে আরজ করল ঃ ব্যাপার কি, আমি যখনই আপনাকে দেখি ভীত হয়ে পড়ি? হাম্মাদ বললেন ঃ এর কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন– আলেম যখন তার এলেম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তখন প্রত্যেক বস্তু তাকে ভয় করে। আর যখন এলেম দ্বারা ধনভাণ্ডার গড়ে তুলতে চায়, তখন সে স্বয়ং প্রত্যেক বস্তুকে ভয় করে। এর পর মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান চল্লিশ হাজার দেরহাম তাঁর খেদমতে উপহার পেশ করে আরজ করল ঃ এগুলো আপনি আপনার প্রয়োজনে ব্যয় করুন। তিনি বললেন ঃ যাদের উপর জুলুম চালিয়ে তুমি এগুলো অর্জন করেছ, তাদেরকে ফেরত দাও। মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান আরজ করল ঃ আল্লাহর কসম, যে মাল আমি আপনার খেদমতে পেশ করছি, তা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি– জুলুম করে কারও কাছ থেকে অর্জন করিনি। হাম্মাদ বললেন ঃ আমার এই মালের কোন প্রয়োজন নেই। মুহাম্মদ বলল ঃ আপনি এ মাল গ্রহণ করে দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিন। তিনি বললেন ঃ আমি বণ্টনে ইনসাফ করতে পারব বলে ভরসা পাই না। যে ব্যক্তি এ মাল থেকে কিছু পাবে না, সে হয় তো বলবে, আমি বণ্টনে ইনসাফ করিনি। ফলে আমার কারণে তার গোনাহ হবে। অতএব এ মাল আমার কাছ থেকে দূরেই রাখ।

বাদশাহদের কাছ থেকে সরে থাকা ঃ বাদশাহদের কাছ থেকে এমনভাবে সরে থাকা ওয়াজিব যাতে সে নিজেও তাদেরকে না দেখে এবং তারাও যেন তাকে না দেখে। কেননা, এক্ষেত্রে এভাবেই নিরাপত্তা বিদ্যমান। সুতরাং বাদশাহদের জুলুমের কারণে অন্তরে তাদের প্রতি শত্রুতা রাখা, তাদের দীর্ঘায়ু কামনা না করা, তাদের প্রশংসা না করা, যারা তাদের তল্পীবাহক, তাদের কাছে না যাওয়া, তাদের কাছ থেকে সরে থাকার কারণে কোন বস্তু না পেলে তজ্জন্যে পরিতাপ না করা ওয়াজিব। আর বাদশাহদের তরফ থেকে সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকলে তা আরও ভাল। যদি অন্তরে এই ধারণা জন্মে যে, বাদশাহদের কাছে অনেক সম্পদ এবং

বিলাস সামগ্রী আছে, তবে আসাম্মের উক্তি স্মরণ করবে। তিনি বলতেন ঃ আমার ও বাদশাহদের মধ্যে মাত্র এক দিনের তফাৎ। কেননা, গতকালকের আনন্দ তো আর আজ তাদের কাছে বসে নেই। আর আগামীকাল কি হবে, সে ব্যাপারে আমি ও তারা উভয়েই শংকিত। সুতরাং কেবল আজকের দিনই বাকী রইল। এক দিনে কি হতে পারে? অথবা হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর উক্তি স্মরণ করবে। তিনি বলতেন ঃ ধনী ব্যক্তিরা পানাহার ও পোশাকে আমাদের শরীক। তারাও পানাহার করে এবং পোশাক পরিধান করে, আমরাও তাই করি। তাদের কাছে অতিরিক্ত ধন-সম্পদ থাকে, যা তারা দেখে এবং আমরাও তাদের সাথে দেখতে পাই। পার্থক্য হচ্ছে, এই ধন-সম্পদের হিসাব তাদেরকে দিতে হবে আর আমরা তা থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন জালেমের জুলুম অথবা পাপীর পাপ সম্পর্কে অবগত হয়, এই অবগতি যেন তার মন থেকে সেই জুলুম ও পাপের গুরুত্ব হ্রাস করে দেয়, এটা জরুরী। কেননা যে ব্যক্তি কুকর্ম করে, সে অবশ্যই মন থেকে পতিত হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর হকে ক্রটি করে, তাকে এমন খারাপ মনে কর, যেমন তোমার হকে ক্রটি করলে মনে করতে।

যদি বল, পূর্ববর্তী আলেমগণ তো বাদশাহদের কাছে যেতেন, তবে এর জওয়াব হচ্ছে, প্রথমে তাঁদের কাছ থেকে বাদশাহদের কাছে যাওয়ার রীতি-নীতি শিখে নাও। এর পর গেলে কোন দোষ নেই। বর্ণিত আছে, বাদশাহ হেশাম ইবনে আবদুল মালেক হজ্জের উদ্দেশে মক্কা মোয়াযযমায় উপনীত হয়ে বলল ঃ সাহাবীগণের কেউ থেকে থাকলে তাঁকে আমার সামনে নিয়ে আস। লোকেরা বলল ঃ তাঁরা তো সকলেই ইন্তেকাল করে গেছেন। সে বলল ঃ কোন তাবেয়ীকে আন। সেমতে লোকেরা হযরত তাউস ইয়ামনীকে (রাহঃ) ডেকে আনল। তিনি হেশামের সামনে গিয়ে জুতা জোড়া ফরাশের কিনারে খুললেন এবং আমীরুল মুমিনীন বলে সালাম না করে বললেন ঃ হে হেশাম, সালামুন আলাইকা। তিনি তার কুনিয়তও উল্লেখ করলেন না। সালামের পর হেশামের ঠিক সামনে আসন গ্রহণ করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে হেশাম, কেমন আছেন? তাঁর কান্ড দেখে হেশাম ক্রুদ্ধ হল। এমন কি, তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করল, কিন্তু লোকেরা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, সে এখন আল্লাহ ও রসূলের হেরেমে আছে। এখানে এটা হতে পারে না। হেশাম হযরত তাউসকে

বলল ঃ তুমি এহেন কর্ম করলে কেন? তিনি বললেন ঃ আমি কি করেছি? এতে হেশামের ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। সে বলল ঃ তুমি আমার সামনে জুতাজোড়া খুলেছ। আমার হস্ত চুম্বন করনি। আমাকে 'আমিরুল মুমিনীন' বলে সালাম করনি। আমার কুনিয়ত উল্লেখ করনি। আমার মুখের সামনে আমার অনুমতি ছাড়াই আসন গ্রহণ করেছ এবং জিজ্ঞেস করেছ– হেশাম, কেমন আছেন? হযরত তাউস জওয়াবে বললেন ঃ জুতা খোলার ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি প্রত্যহ পাঁচবার রব্বুল ইযযত আল্লাহ পাকের সামনে জুতা খুলি। তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধও হন না এবং আমাকে শাস্তিও দেন না। হস্ত চুম্বন না করার কারণ, আমি হযরত আলী (রাঃ)-এর মুখ থেকে শুনেছি– পুরুষের জন্যে কারও হস্ত চুম্বন করা জায়েয নয়। তবে স্বামী কামবশতঃ স্ত্রীর হস্ত আর পিতা স্নেহবশতঃ সন্তানের হস্ত চুম্বন করতে পারে। আমি আমিরুল মুমিনীন বলে আপনাকে সালাম করিনি। এর কারণ, সকল মানুষ আপনার শাসনক্ষমতা লাভে সন্তুষ্ট নয়; তাই আমি মিথ্যা বলা পছন্দ করিনি। কুনিয়ত উল্লেখ না করার হেতু হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর পয়গম্বরগণকে নাম ধরেই ডেকেছেন, কুনিয়ত সহকারে নয়। তিনি বলেছেন– ইয়া দাউদ, ইয়া ইয়াহইয়া, ইয়া ঈসা। এর বিপরীতে তিনি তাঁর দুশমনদের কুনিয়ত উল্লেখ করেছেন ঃ تَبَّتْ يَدَا أَبِى لَهَبٍ (আবু লাহাবের হস্তদ্বয় নিপাত যাক।) সামনে বসার কথা যে বলেছেন, এর কারণ, আমি হযরত আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, জাহান্নামে পর্বতশৃঙ্গের মত সর্প আর খচ্চরের অনুরূপ বিচ্ছু রয়েছে । এরা সেই সব শাসককে দংশন করবে, যারা তাদের প্রজাদের প্রতি ইনসাফ করে না। এর পর হযরত তাউস সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

হযরত সুফিয়ান সওরী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মিনায় আবু জাফর মনসুরের নিকট তশরীফ নিলে সে আরজ করল ঃ আপনি আপনার প্রয়োজন ব্যক্ত করুন। হযরত সুফিয়ান বললেন ঃ আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। কারণ, তুমি জুলুম ও সীমালঙ্ঘন দ্বারা পৃথিবীকে পূর্ণ করে দিয়েছ। মনসুর মাথা নত করল। এর পর মাথা তুলে বলল ঃ আপনার অভাব অনটন পেশ করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি কেবল মুহাজির ও আনসার-সন্তানগণের তরবারির জোরে এই মর্যাদায় পৌঁছেছ। এখন তাঁদের সন্তানরা ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করছে। আল্লাহকে ভয় কর এবং তাদের হক তাদের হাতে সমর্পণ কর। মনসুর আবার মাথা নত করল। অবশেষে

মাথা তুলে বলল ঃ নিজের প্রয়োজন বলুন। তিনি বললেন ঃ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হজ্জ করার পর তাঁর কোষাধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– আমি কি পরিমাণ ব্যয় করলাম? কোষাধ্যক্ষ আরজ করেছিলেন ঃ দশ দেরহামের কিছু বেশী। আর এখন তোমার সাথে এত মাল দেখছি, যা উটও বহন করতে পারে না। একথা বলে তিনি চলে গেলেন। এই ছিল আগেকার যুগের মনীষীগণের বাদশাহদের কাছে যাওয়ার রীতিনীতি। তাঁরা বাদশাহদের জুলুমের বিরুদ্ধে আল্লাহর ওয়াস্তে প্রতিরোধ করার জন্যে জীবনপন করে দিতেন।

ইবনে আবী নমলা (রহঃ) আবদুল মালেকের কাছে তশরীফ নিয়ে গেলে সে আরজ করল ঃ কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ কেয়ামতের ক্রোধ, তিক্ততা ও ধ্বংসকারিতা দেখে তারাই কেবল স্থির থাকতে পারবে, যারা আপন প্রবৃত্তিকে নারাজ করে আল্লাহ তাআলাকে রাজি করে থাকবে। আবদুল মালেক কেঁদে ফেলে বলল ঃ আমি যতদিন বেঁচে থাকব, এ বাক্যটি চোখের সামনে রাখব। হযরত ওসমান গনী (রাঃ) খলীফা হলে সকল সাহাবী তাঁর খেদমতে হাযির হলেন, কিন্তু তাঁর বন্ধু হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) অনেক বিলম্বে উপস্থিত হলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এজন্যে তাঁর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলে তিনি বললেন ঃ আমি রসূলে খোদা (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– মানুষ যখন কোন রাষ্ট্রের কর্ণধার নিযুক্ত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার কাছ থেকে দূরে সরে পড়েন। হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বসরার শাসনকর্তার দরবারে গেলেন এবং বললেন ঃ আমি কোন এক কিতাবে দেখেছি, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন– "বাদশাহের চেয়ে বেশী বেওকুফ কেউ নয়। যে আমার নাফরমানী করে, তার চেয়ে অধিক প্রতারক কেউ নয়। হে মন্দ রাখাল, আমি তোমাকে মোটা তাজা ও সুস্থ ভেড়া-ছাগল দিয়েছি। তুমি তাদের গোশত খেয়ে এবং পশম পরিধান করে সেগুলিকে কংকালসার করে দিয়েছ। বসরার শাসনকর্তা বলল ঃ আপনি কি জানেন, কেন আপনি আমাদের বিরুদ্ধে এত নির্ভীক? তিনি বললেন ঃ না। সে বলল ঃ এর কারণ, আপনি আমাদের কাছে কম আশা করেন এবং ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেন না। একবার হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) খলীফা সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেকের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ বজ্রপাতের আওয়াজ শুনে সোলায়মান ভীত কম্পিত হয়ে গেল। হযরত

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ বললেন ঃ এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার রহমতের আওয়াজ। যখন তাঁর আযাবের আওয়াজ শুনবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে? কথিত আছে, সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেক মক্কার উদ্দেশে মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হয়ে আবু হাযেমকে (রহঃ) ডাকলেন এবং বললেন ঃ আমরা মৃত্যুকে খারাপ মনে করি কেন? তিনি বললেন ঃ কারণ, তুমি তোমার আখেরাতকে বরবাদ করেছ এবং দুনিয়াকে আবাদ করেছ। তাই আবাদ ভূমি থেকে পতিত ভূমিতে যাওয়া খারাপ মনে কর। সোলায়মান প্রশ্ন করলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে যাওয়ার অবস্থাটা কেমন হবে? তিনি বললেন ঃ নেক বান্দারা এমনভাবে যাবে, যেমন কোন মুসাফির ব্যক্তি গৃহে ফিরে আসে। আর গোনাহগাররা এমনভাবে যাবে যেমন কোন পলাতক গোলামকে তার প্রভুর সামনে ধরে আনা হয়। সোলায়মান কেঁদে কেঁদে বললেন ঃ হায়, আমি যদি জানতাম আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার অবস্থা কিরূপ হবে! আবু হাযেম (রহঃ) বললেন ঃ নিজের অবস্থা কোরআন মজীদের অনুরূপ করে নাও। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ وَّاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ অর্থাৎ, নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণরা নেয়ামতের মধ্যে এবং পাপাচারীরা জাহান্নামের মধ্যে থাকবে। সোলায়মান বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ তা'আলার রহমত কোথায়? তিনি বললেন ঃ

اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকর্ম সম্পাদনকারীদের নিকটবর্তী। সোলায়মান জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কে বেশী সম্মানিত? তিনি বললেন ঃ যারা মুত্তাকী বা খোদাভীরু। প্রশ্ন হল ঃ সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ হারাম থেকে বেঁচে থাকার সাথে ফরযসমূহ আদায় করা। প্রশ্ন হল ঃ কথার মধ্যে অধিক শ্রবণযোগ্য কথা কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ সত্য বাক্য তার সামনে বলা, যার কাছে আশাও করা হয় এবং যাকে ভয়ও করা হয়। প্রশ্ন হল ঃ মুমিনদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী কে? উত্তর হল ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে আমল করে এবং মানুষকে এজন্যে উদ্বুদ্ধ করে। প্রশ্ন হল ঃ মুমিনদের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কে? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের জালেম ভাইয়ের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে এবং নিজের আখেরাতকে অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রয় করে। এর পর

সোলায়মান প্রশ্ন করলেন ঃ আমরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছি, সে সম্পর্কে আপনি কি বলেন? আবু হাযেম বললেন ঃ আগে বল, তুমি আমাকে শাস্তি দেবে কি না? বললেন ঃ না, বরং উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! তোমাদের পিতৃপুরুষরা জনগণের উপর তরবারির ধার প্রয়োগ করে এই দেশ জবরদখল করেছে। মুসলমানদের সাথে পরামর্শও করেনি এবং তাদের সম্মতিক্রমেও দখল করেনি। অবশেষে তারা অনেক খুনখারাবি করে দুনিয়া থেকে চলে গেছে। হায়, এখন যদি তুমি জানতে, তারা কি করেছে এবং জনগণ তাদেরকে কি বলেছে! সোলায়মানের সহচরদের থেকে এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আবু হাযেম! আপনি একথাটি ভাল বলেননি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা আলেমগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তারা জনগণের কাছে সত্য কথা বর্ণনা করবেন এবং সত্য গোপন করবেন না। সোলায়মান আরজ করলেন ঃ আমরা পূর্বপুরুষদের এই কলংক মোচন করব কিরূপে? তিনি বললেন ঃ হালাল পথে ধন উপার্জন কর এবং যথাস্থানে ব্যয় কর। তিনি বললেন ঃ এটা কার দ্বারা সম্ভবপর? আপনি আমার জন্যে দোয়া করুন। আবু হাযেম বললেন ঃ ইলাহী, সোলায়মান আপনার দোস্ত হলে তার জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সহজ করে দিন। আর শত্রু হলে তাকে জোর করে হলেও আপনার প্রিয় কাজে নিয়োজিত করুন। অতঃপর সোলায়মান বললেন ঃ আপনি আমাকে ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ আমি সংক্ষেপে ওসিয়ত করছি– আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা এতদূর ধ্যান কর যে, তিনি যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা করতে যেন তোমাকে না দেখেন এবং যে কাজ করতে আদেশ করেছেন, তা করতে যেন তোমাকে দুর্বল না পান। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) আবু হাযেমকে বললেন ঃ আমার জন্যে দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ শয়ন করে ধ্যান করবে যে, মৃত্যু তোমার মাথার উপরে বিদ্যমান এবং এটা ইন্তেকালের সময়। এর পর ধ্যান করবে– এই মুহূর্তে কোন্ গুণটি তুমি নিজের মধ্যে থাকা পছন্দ কর এবং কোন্ গুণটি থাকা পছন্দ কর না। যে গুণটি থাকা পছন্দ কর, সেটি তখন থেকেই অবলম্বন কর এবং যে গুণটি পছন্দ কর না, সেটি তখনই বর্জন কর। কেননা, সম্ভবতঃ আখেরাতের সময় নিকটবর্তী।

জনৈক বেদুঈন সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেকের কাছে এলে

তিনি তাকে বললেন ঃ কি চাও? সে বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন, আমি আপনাকে কিছু বলব। সহ্য করে নেবেন। সহ্য না করলে পরে আফসোস করবেন। সোলায়মান বললেন ঃ আমার সহনশীলতা এত বিস্তৃত যে, যার কাছ থেকে উপদেশ আশা করি না এবং দোয়ার সম্ভাবনা দেখি, তার সাথেও সহনশীল আচরণ করি। আর যে ব্যক্তি আমাকে উপদেশ দেবে এবং প্রতারণা করবে না, তার সাথে সহনশীল হব না কেন? বেদুঈন বলল ঃ হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার চারপাশে এমন লোক রয়েছে, যারা নিজেদের স্বার্থে মন্দ পথ অবলম্বন করছে এবং দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করছে। তারা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির বিনিময়ে আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করছে। আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে তো তারা আপনাকে ভয় করেছে, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করেনি। তারা আখেরাতের সাথে যুদ্ধ এবং দুনিয়ার সাথে সন্ধি পছন্দ করেছে। অতএব আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে বিষয়ে বিশ্বস্ত প্রতিনিধি করেছেন, আপনি সে বিষয়ে তাদেরকে প্রতিনিধি করবেন না। কারণ, তারা আমানত বিনষ্ট করতে এবং মুসলমানদেরকে হেয় ও লাঞ্ছিত করতে কোন ত্রুটি করেনি। তাদের কাজকর্মের জবাবদিহি আপনাকে করতে হবে, কিন্তু আপনার কাজ-কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না। আপনি নিজের পরকাল নষ্ট করে তাদের দুনিয়া সুখকর করবেন না। কেননা, সে ব্যক্তিই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত, যে অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের পরকাল বিনষ্ট করে। সোলায়মান বললেন ঃ হে বেদুঈন! তুমি তোমার মুখের তরবারি দিয়ে পাষাণ বিদীর্ণ করতে চাইলে, কিন্তু এত ধার কি তোমার তরবারিতে আছে? বেদুঈন বলল ঃ ঠিক বলেছেন, কিন্তু এসব কথা আপনার উপকারের জন্যে, ক্ষতির জন্যে নয়।

বর্ণিত আছে, সাধক আবু বকর হযরত মোআবিয়ার কাছে গিয়ে বললেন ঃ হে মোআবিয়া, আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রাখ, যতই দিন অতিবাহিত হয়ে রাত্রি আগমন করে, ততই তুমি দুনিয়া থেকে দূরবর্তী এবং পরকালের নিকটবর্তী হচ্ছ। তোমার পেছনে এমন অন্বেষণকারী আছে, যার কবল থেকে তুমি বাঁচতে পারবে না। তোমার জন্যে একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে, যার আগে তুমি যেতে পারবে না। তুমি সত্বরই সেই সীমায় পৌঁছে যাবে এবং অনতিবিলম্বে সেই অন্বেষণকারী তোমাকে এসে ধরবে। আমরা এবং আমাদের সাজ-সরঞ্জাম সমস্তই ধ্বংসশীল। যেখানে

আমরা যাব, সেটা অক্ষয়। আমাদের ক্রিয়াকর্ম ভাল হলে প্রতিদানও ভাল হবে, আর মন্দ হলে প্রতিদানও মন্দ হবে।

মোট কথা, যারা আখেরাতের আলেম, তারা বাদশাহদের কাছে এভাবে যেতেন, যা উপরে বর্ণিত হল, কিন্তু দুনিয়াদার আলেমরা তাদের কাছে যায় নৈকট্য হাসিল করার উদ্দেশে। তারা শাসকবর্গকে নানা ধরণের অন্যায়ে সম্মতি দেয় এবং সূক্ষ্ম কৌশল ও নিজেদের মতলব অনুযায়ী পরিত্রাণের উপায় বলে দেয়। যদি ওয়ায প্রসঙ্গে তাদেরকে উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহ বর্ণনাও করে, তবুও তাতে উদ্দেশ্য শাসকবর্গের সংশোধন থাকে না; বরং স্বীয় মাহাত্ম্য, জাঁকজমক ও শাসকবর্গের দৃষ্টিতে প্রিয় হওয়া উদ্দেশ্য থাকে। এক্ষেত্রে বোকামিবশতঃ দু'টি ভুল করা হয়। এক, জনগণকে একথা বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, আমাদের শাসকদের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে সংশোধন করা। অথচ অন্তরে প্রায়শঃ একথা থাকে না। উদ্দেশ্য যা থাকে, তা হচ্ছে সুখ্যাতি অর্জন করা এবং শাসকদের কাছে পরিচিত হওয়া। সংশোধন উদ্দেশ্য সত্য হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে, যদি অন্য কোন আলেম এই সংশোধনের দায়িত্ব নেয় এবং তার ওয়ায প্রভাবশালী হতে দেখা যায়, তবে এতে তার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত এবং আল্লাহ তা'আলার শোকর করা উচিত যে, যে গুরুদায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম, তা অন্যের হাতে সম্পন্ন হয়ে গেছে। ফলে আমি কষ্ট থেকে বেঁচে গেছি। উদাহরণতঃ কোন দুরারোগ্য রোগীর শুশ্রূষা করা একজনের উপর জরুরী হলে যদি অন্য কেউ এসে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে স্বভাবতই প্রথম ব্যক্তি সন্তুষ্ট হবে। সুতরাং যদি কেউ নিজের ওয়াযকে অন্যের ওয়াযের উপর অগ্রাধিকার দেয়, তবেই বুঝা যাবে উদ্দেশ্য শাসকদের সংশোধন নয়; বরং অন্য কিছু।

দ্বিতীয়তঃ বলা হয়, আমি কোন মুসলমানের উপর থেকে জুলুম অপসারিত করার জন্যে শাসকদের কাছে যাই। এটাও আত্মপ্রবঞ্চনা এবং যাচাই করার কষ্টিপাথরও তাই, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

বাদশাহদের কাছে যাওয়ার নিয়মনীতি সুস্পষ্ট হওয়ার পর আমরা এখানে কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করছি, যদ্দ্বারা বাদশাহদের সাথে মেলামেশা করা ও তাদের বস্তু সামগ্রী নেয়ার কিছু অবস্থা জানা যাবে।

(১) বাদশাহ্ কিছু বস্তু সামগ্রী ফকীরদের মধ্যে বণ্টন করার জন্যে

তোমার কাছে প্রেরণ করলে যদি সে সামগ্রীর কোন নির্দিষ্ট মালিক থাকে, তবে তা নেয়া তোমার পক্ষে হালাল নয়। আর যদি নির্দিষ্ট মালিক না থাকে তবে তা গ্রহণ করে মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দেবে। বণ্টন না করে নিজে নিয়ে নিলে গোনাহগার হবে। কোন কোন আলেম গ্রহণ করতেই অস্বীকার করেন। এখন এতে উত্তম কোন্‌টি তাই দেখা উচিত।

আমরা বলি, যদি তিনটি আশংকা থেকে মুক্ত হও, তবে গ্রহণ করা তোমার পক্ষে উত্তম। প্রথম আশংকা– তোমার গ্রহণ করার কারণে বাদশাহের বুঝে নেয়া যে, তার সম্পদ পবিত্র। পবিত্র না হলে তুমি তার জন্যে হাত বাড়াতে না। সুতরাং পরিস্থিতি এরূপ হলে সে সম্পদ গ্রহণ করবে না। কারণ, তা গ্রহণ করা বিপজ্জনক। কেননা, তোমার হাতে এই সম্পদ বণ্টন করলে যে কল্যাণ হবে, তা সে অনিষ্টের তুলনায় কম হবে, যা বাদশাহের হারাম সম্পদ উপার্জনে সাহসী হওয়ার কারণে হবে।

দ্বিতীয় আশংকা হল তোমার দেখাদেখি অন্য আলেম অথবা জাহেলের সে সম্পদ গ্রহণ জায়েয মনে করা এবং তা মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন না করা। এ অনিষ্টটি প্রথম অনিষ্টের তুলনায় বড়। সেমতে কিছু লোক গ্রহণ করার বৈধতার সপক্ষে ইমাম শাফেয়ীকে পেশ করে, কিন্তু তিনি যে ফকীরদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন, তা দেখে না। অতএব, অনুসৃত ব্যক্তির এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, তার কাজ অনেক মানুষের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে যায়। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রহঃ) বলেন ঃ এক বাদশাহের সামনে এক ব্যক্তিকে ধরে আনা হল। বাদশাহ জনসমক্ষে তাকে জবরদস্তিমূলকভাবে শূকরের মাংস খাওয়াতে চাইল। সে খেল না। এর পর তার সামনে ছাগলের গোশত রেখে তরবারি উচিয়ে হুমকি দেয়া হল, সে তাও খেল না। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ লোকেরা জেনেছে, আমাকে শূকরের মাংস খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এখন যদি আমি জীবিত অবস্থায় তাদের সামনে যেতাম এবং কিছু খেয়ে নিতাম, তবে তারা জানত না, আমি কি খেয়েছি। ফলে তারা গোমরাহ হয়ে যেত।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ ও তাউস (রহঃ) একবার হাজ্জাজের ভাই মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের কাছে গেলেন। লোকটি ছিল খামখেয়ালী প্রকৃতির। শীতের দিনে সে একটি খোলা মজলিসে বসে ছিল। তাঁরা উভয়েই নির্ধারিত আসনে বসে গেলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ তার

গোলামকে একটি চাদর এনে তাউসের গায়ে পরিয়ে দিতে বলল। সে আদেশ পালন করল। তাউস নিজের কাঁধ হেলাতে লাগলেন। অবশেষে চাদর কাঁধ থেকে পড়ে গেল। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল ঃ স্বীকার করলাম, আপনার চাদরের প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এটি গ্রহণ করে সদকা করে দিলে কি ক্ষতি হত? তিনি বললেন ঃ তাহলে লোকেরা কেবল এটাই বলত, তাউস চাদর গ্রহণ করেছেন। আমার সদকা করা তারা দেখত না। তাই আমি এটা গ্রহণ করিনি।

তৃতীয় আশংকা হল, বাদশাহ কেবল তোমার কাছেই বিশেষভাবে প্রেরণ করেছে– অন্য কারও কাছে প্রেরণ করেনি– দেখে তোমার অন্তরে তার প্রতি মহব্বত উথলে উঠা। এরূপ আশংকা থাকলে কখনও গ্রহণ করবে না। কেননা, জালেমদের প্রতি মহব্বত বিষতুল্য। এটা এমন ব্যাধি, যার কোন প্রতিকার নেই। কেননা মানুষ যাকে মহব্বত করে তার দোষক্রটির ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে থাকে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করাই মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ اللهم لاتجعل الفاجر عندى هدا فيحبه قلبى ইলাহী, আমাকে কোন পাপাচারীর কাছে ঋণী করবেন না। করলে আমার অন্তর তাকে ভালবাসতে থাকবে। এতে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষের অন্তর মহব্বত থেকে সাধারণতঃ মুক্ত থাকে না। কথিত আছে, জনৈক শাসক হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ)-এর কাছে দশ হাজার দেরহাম প্রেরণ করলেন ঃ তিনি নিঃশেষে তা ফকীরদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। এর পর তাঁর কাছে মুহম্মদ ইবনে ওয়াসে' (রঃ) আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেই শাসক তোমার কাছে যে দেরহাম পাঠিয়েছিল, তা কি করেছ? তিনি বললেন ঃ আমার খাদেমদেরকে জিজ্ঞেস কর। খাদেমরা বলল ঃ তিনি সম্পূর্ণ অর্থ বিলিয়ে দিয়েছেন। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' বললেন ঃ আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি– তোমার অন্তরে সেই শাসকের প্রতি মহব্বত এখন বেশী, না অর্থ পাঠানোর পূর্বে বেশী ছিল? তিনি বললেন ঃ এখন বেশী। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' বললেন, আমি তাই আশংকা করছিলাম।

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' সত্যই বলেছেন। কেননা, যখন শাসককে মহব্বত করবে, তখন তার দীর্ঘায়ু কামনা করবে এবং তার পদচ্যুতি

অপছন্দ করবে; বরং তার শাসন বিস্তৃত হওয়া এবং সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া পছন্দ করবে। এসব বিষয় জুলুমের সহায়ক কারণ।

হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) ও ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কাজে সন্তুষ্ট থাকে, সে অনুপস্থিত থাকলেও এমন হবে যেন সে কাজে শরীক ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ـ

অর্থাৎ, যারা জালেম, তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না।

কোন কোন তফসীরকারের মতে এর অর্থ হচ্ছে, জালেমদের কাজ-কর্মে সম্মত হয়ো না। সুতরাং তোমার যদি অতটুকু সামর্থ্য থাকে যে, সম্পদ গ্রহণ করলে বাদশাহদের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি পাবে না, তবে গ্রহণ করা মোটেও দূষণীয় হবে না। সে মতে বসরার জনৈক আবেদের ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। তিনি বাদশাহদের কাছ থেকে সম্পদ গ্রহণ করে হকদারদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করল ঃ আপনি কি বাদশাহদেরকে ভালবাসার আশংকা করেন না? তিনি বললেন ঃ যদি কেউ আমাকে হাতে ধরে জান্নাতে দাখিল করিয়ে দেয়, এর পর সে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে, তবে এতটুকু সদ্ব্যবহার সত্ত্বেও আমার অন্তর তাকে মহব্বত করবে না। কেননা, যে সত্তা তাকে আমার হাত ধরতে বাধ্য করেছে, তাঁর খাতিরেই আমি এ ব্যক্তিকে শত্রু মনে করি। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল, বাদশাহদের কাছ থেকে সম্পদ গ্রহণ করা কোন কোন কারণে জায়েয হলেও বর্তমান যুগে তা নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। কেননা, বর্তমান যুগে বাদশাহের ধন সম্পদ গ্রহণ করা উপরোক্ত অনিষ্ট থেকে মুক্ত নয়।

(২) যদি কেউ প্রশ্ন করে, বাদশাহের দেয়া সম্পদ গ্রহণ করা এবং ফকীরদের মধ্যে বন্টন করা যখন জায়েয, তখন বাদশাহের সম্পদ চুরি করে তা ফকীরদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া জায়েয হবে না কেন? এর জওয়াব হচ্ছে, তা জায়েয নয়। কেননা, বাদশাহের সম্পদ এমনও হতে পারে যার কোন নির্দিষ্ট মালিক রয়েছে এবং বাদশাহ তার কাছে তা ফিরিয়ে দেয়ার নিয়ত রাখে। সুতরাং চুরি করা সম্পদ সেই সম্পদের মত নয়, যা বাদশাহ নিজে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। কেননা, বাদশাহ সম্পর্কে সাধারণত এরূপ ধারণা করা যায় না যে, কোন সম্পদের

মালিক জানা সত্ত্বেও সে তা খয়রাত করে দেবে। সুতরাং বাদশাহের দেয়া এ বিষয়ের প্রমাণ যে, সে সেই সম্পদের মালিক কে তা জানে না। যদি কোন বাদশাহ এসব ব্যাপারে অসাবধান হয়, তবে তার সম্পদ সম্পর্কে পরিপূর্ণ খোঁজ-খবর না নেয়া পর্যন্ত গ্রহণ করা উচিত নয়।

(৩) জালেমদের নির্মিত পুল, সরাইখানা, মসজিদ ইত্যাদির ব্যাপারেও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ, পুলের উপর দিয়ে যাওয়া প্রয়োজনের সময় জায়েয এবং যথাসম্ভব তা থেকে বিরত থাকা পরহেযগারী। নৌকা পাওয়া গেলে পরহেযগারীর দাবী জোরদার হয়ে যাবে। নৌকা পাওয়া গেলেও পুলের উপর দিয়ে যাওয়া আমরা জায়েয বলেছি। এর কারণ, পুলের সামগ্রীসমূহের যখন কোন নির্দিষ্ট মালিক জানা নেই, তখন তার বিধান হচ্ছে খয়রাতে ব্যয় করা। পুলের উপর দিয়ে যাওয়াও একটি খয়রাত, কিন্তু যদি জানা যায়, পুলের ইট ও পাথর অমুক বাড়ী, কবরস্থান অথবা মসজিদ থেকে উঠিয়ে এনে লাগানো হয়েছে, তবে সে পুল দিয়ে যাওয়া জায়েয নয়।

যদি মসজিদ জবর দখল করা যমীনে নির্মিত হয়, তবে তার ভেতরে জমাত কিংবা জুমআর জন্যে যাওয়া কস্মিনকালেও জায়েয নয়। এমনকি, যদি ইমাম মসজিদের ভেতরে দাঁড়ায়, তবে তুমি তার পিছনে মসজিদের বাইরে দাঁড়াবে। কেননা, জবরদখলকৃত যমীনে নামায পড়লে যদিও ফরয থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং এক্তেদাও জায়েয হয়ে যায়, কিন্তু তার ভেতরে দাঁড়ানো গোনাহ। যদি জালেমরা এমন সামগ্রী দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করে, যার মালিক জানা নেই, তবে অন্য মসজিদ পাওয়া গেলে সেখানে চলে যাওয়াই পরহেযগারী। অন্য মসজিদ না থাকলে জুমআ ও জামাত তরক করবে না। কেননা, এরূপ সম্ভাবনাও আছে যে, জালেম নির্মাতা নিজের মালিকানার অর্থেই নির্মাণ করেছে। জবরদখলকৃত যমীনে নির্মিত মসজিদে নামায পড়তে কোন দোষ নেই, যদি সে যমীনের নির্দিষ্ট কোন মালিক না থাকে। মসজিদে জালেমদের বিছানো চাটাই ও মাদুরের মালিক নির্দিষ্ট থাকলে তার উপর বসা হারাম। মালিক নির্দিষ্ট না থাকলে এগুলো বিছানো জায়েয, কিন্তু যথাসম্ভব এগুলো বর্জন করা এবং যে মসজিদে জালেমদের বিছানো চাটাই নেই, সেখানে চলে যাওয়া পরহেযগারী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উপস্থিত জরুরী মাসআলা

(১) প্রশ্ন করা হয়েছে, সুফীগণের খাদেম বাজার থেকে তাদের জন্যে যে খাদ্য সংগ্রহ করে আনে অথবা নগদ মূল্য দিয়ে কিনে আনে, তা থেকে অন্য কারও পক্ষে কিছু খাওয়া হালাল কি না? আমি এর জওয়াব এই দিয়েছি যে, অন্য সুফী ব্যক্তির এ থেকে খাওয়া যে হালাল তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যে সুফী নয়, সে খাদেমের সম্মতিক্রমে খেলে তা-ও হালাল। তবে সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়। হালাল হওয়ার কারণ, সুফীগণের খাদেমকে যারা কোন বস্তু দেয়, তারা সুফীগণের কারণে দেয়, কিন্তু গ্রহণকারী খাদেম নিজে সুফীগণের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, সন্তান-সন্ততিওয়ালা ব্যক্তি সন্তান-সন্ততির কারণে মানুষের কাছ থেকে কিছু পেলে সে তার মালিক হয়ে যায়– সন্তান-সন্ততি মালিক হয় না। সে সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যকেও এ থেকে খাওয়াতে পারে।

(২) প্রশ্ন করা হওয়ছে যে, কিছু বস্তু সামগ্রী সুফীদের জন্যে ওসিয়ত করা হল। এখন এই সম্পদ কিরূপ লোকের মধ্যে ব্যয় করতে হবে? আমি জওয়াবে বললাম, তাসাওউফ একটি অন্তরের বিষয়, যা বাইরে থেকে জানা যায় না। তাসাওউফের স্বরূপও নিশ্চিতরূপে বিধিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়; বরং কয়েকটি বাহ্যিক বিষয় বর্ণনা করা যায়, যার উপর ভরসা করে পরিভাষায় মানুষকে সুফী বলা হয়। এ ব্যাপারে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। (১) নেক হওয়া, (২) ফকীর হওয়া, (৩) সুফীদের পোশাক পরা, (৪) কোন পেশায় নিয়োজিত না থাকা এবং (৫) সুফীদের খানকায় তাঁদের সাথে মিলেমিশে থাকা। এসব গুণের মধ্যে কোন কোনটি এমন যে, তা মানুষের মধ্যে না থাকলে সুফী শব্দও তার জন্যে প্রয়োগ করা হবে না। উদাহরণত যে ব্যক্তি নেক নয়, বরং ফাসেক, সে সুফী কথিত হওয়ার যোগ্য হবে না। কেননা, সুফী সাধারণতঃ নেক লোককে বলা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তির ফাসেকী প্রকাশ পাবে সে সুফীদের পোশাক পরিধান করলেও তাদের জন্যে ওসিয়ত করা সম্পদের হকদার হবে না। এ ক্ষেত্রে সগীরা গোনাহ ধর্তব্য নয়। ফাসেকীর অর্থ কবীরা গোনাহ করা। পেশা অবলম্বন করা এবং উপার্জনে

আত্মনিয়োগ করাও হকদার হওয়ার পরিপন্থী। সুতরাং কৃষক, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, দোকানে কিংবা গৃহে পেশায় লিপ্ত ও মজুর সে সম্পদের হকদার নয়, যা সুফীদের জন্যে ওসিয়ত করা হয়। হাঁ, লেখা ও সেলাই করা, যা সুফীদের দ্বারা হতে পারে, তা যদি গৃহে হয় এবং দোকানে না হয়, তবে তা হকদার হওয়ার পরিপন্থী নয়। এই ক্ষতি সুফীদের সাথে থাকা ও অন্যান্য গুণ দ্বারা পূরণ হয়ে যাবে। ওয়ায করা এবং দরস দেয়া সুফী শব্দের পরিপন্থী নয়; যদি পোশাক, সুফীদের সাথে থাকা এবং ফকীরী পাওয়া যায়। কেননা, সুফীর সাথে কারী, ওয়ায়েয, আলেম ও মুদাররেস হওয়ার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। ফকীরী হচ্ছে, যদি কারও কাছে এই পরিমাণ মাল হয়ে যায়, যদ্দরুন মানুষ বাহ্যতঃ তাকে সচ্ছল বলতে থাকে, তবে সুফীদের জন্যে ওসিয়তকৃত মাল গ্রহণ করা তার জন্যে জায়েয নয়, কিন্তু যদি মাল থাকে এবং তা দ্বারা ব্যয় নির্বাহ না হয়, তবে তার হক বাতিল হবে না। এক্ষেত্রে সুফীদের সাথে থাকারও প্রভাব আছে। তবে কেউ যদি সুফীদের সাথে না থাকে; বরং নিজের বাড়ী অথবা মসজিদে থাকে, কিন্তু পোশাক ও চরিত্র তাদেরই মত হয়, তবে সে-ও সে মালে শরীক হবে। যদি পোশাকও তাদের মত না হয় এবং অন্যান্য গুণ পাওয়া যায়, তবে শরীক হবে না। যে ফকীর সুফীদের মত পোশাক পরে না এবং খানকায়ও থাকে না, সে সুফী বলে গণ্য হবে না। যে সুফীর স্ত্রী আছে, ফলে সে কখনও গৃহে এবং কখনও খানকায় থাকে, সে সুফীদের দল থেকে খারিজ হবে না।

(৩) প্রশ্ন করা হয়েছে, ঘুষ ও উপঢৌকনের মধ্যে পার্থক্য কি? উভয়টিই সম্মতিক্রমে দেয়া হয় এবং উদ্দেশ্যও উভয়ের মধ্যে এক থাকে। এমতাবস্থায় ঘুষ হারাম এবং উপঢৌকন হালাল হল কেন?

আমি জওয়াব দিলাম, উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ কখনও অর্থ ব্যয় করে না, কিন্তু অর্থ দেয়ার উদ্দেশ্য পাঁচ প্রকার হতে পারে। (১) আখেরাতের সওয়াবের উদ্দেশে অর্থ দেয়া। কেননা, যাকে দেয়া হবে সে নিঃস্ব, সম্ভ্রান্ত, আলেম অথবা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি হবে। যদি কাউকে নিঃস্ব মনে করে দেয়া হয়; কিন্তু বাস্তবে সে নিঃস্ব না হয়, তবে গ্রহণকারীর জন্যে তা গ্রহণ করা হালাল নয়। যদি আলেম হওয়ার কারণে অর্থ দেয়া হয়, তা গ্রহণ করা তখন হালাল হবে, যখন সে দাতার বিশ্বাসের অনুরূপ আলেম হবে। যদি দাতা তাকে কামেল মনে করে দেয়, যাতে সওয়াব বেশী হয়, কিন্তু সে

কামেল নয়, তবে গ্রহণ করা তার জন্যে হালাল হবে না। আর যদি ধর্মপরায়ণতার কারণে অর্থ দেয়া হয় আর অন্তরে সে এমন ফাসেক যে দাতা জানতে পারলে তাকে দিত না, তবে তার জন্যেও গ্রহণ করা হালাল হবে না। এমন নেক লোক কমই হয়, যাদের অন্তরের অবস্থা প্রকাশ হয়ে গেলে মানুষের মন তাদের দিকে আকৃষ্ট থাকে। আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক গোপন রাখাই এক মানুষকে অন্য মানুষের প্রিয় করে রাখে। অতএব ধর্মপরায়ণতার কারণে যা পাওয়া যায়, তা গ্রহণ করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা উচিত।

(২) কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে দেয়া; যেমন ফকীর ব্যক্তি উপঢৌকন পাওয়ার আশায় কোন ধনীকে কিছু দেয়। এটা বিনিময়ের শর্তে উপঢৌকন। এটা গ্রহণ করা তখনই হালাল হবে, যখন যে বিনিময়ের আশায় দেয়া হয়, তা পাওয়া যায় এবং লেনদেনের সকল শর্তও তাতে বিদ্যমান থাকে।

(৩) কোন নির্দিষ্ট কাজ দ্বারা সাহায্যের উদ্দেশে দেয়া। উদাহরণতঃ বাদশাহের কাছে এক ব্যক্তির কোন প্রয়োজন রয়েছে। সে বাদশাহের উকিল কিংবা অন্য কোন মর্যাদাবান ব্যক্তিকে কিছু হাদিয়া দেয়। বলাবাহুল্য, এটাও বিনিময়ের শর্তে উপঢৌকন। এখানে হাদিয়ার বিনিময়ে যে কাজটি সে হাসিল করতে চায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেটি হারাম কাজ হলে এই হাদিয়া গ্রহণ করা হারাম, যেমন হারাম ভাতা জারি হওয়া কিংবা কোন ব্যক্তিকে উৎপীড়ন করা। আর যদি সে কাজটি করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে ওয়াজিব থাকে, তবে এর জন্যে উপঢৌকন নেয়া হারাম। যেমন– জুলুম প্রতিরোধ করা কিংবা সাক্ষ্য দেয়া। কেননা, যার জুলুম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে, তার উপর জুলুম প্রতিরোধ করা ওয়াজিব। এমনিভাবে ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দেয়া ওয়াজিব। এ ধরনের কাজের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করাই ঘুষ, যা নিঃসন্দেহে হারাম। আর যদি সে কাজটি হারাম না হয় এবং করাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর ওয়াজিব না হয়; বরং বৈধ হয়; এছাড়া কাজটি সম্পাদনও এমন শ্রমসাধ্য হয়, যার কারণে সাধারণ লোক মজুরি নিয়ে থাকে, তবে এ ধরনের কাজের বিনিময়ে হাদিয়া নেয়া এই শর্তে হালাল যে, গ্রহীতা দাতার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দেবে। এ হাদিয়াটি মজুরির

স্থলবর্তী। উদাহরণতঃ কাউকে এরূপ বলা, আমার এ আর্জিটি বাদশাহের কাছে পৌছে দিলে তোমাকে এক দীনার দেব। বিচারকের সামনে উকিলের বিতর্ক এবং সেজন্যে মজুরি নেয়াও এই পর্যায়ে পড়ে, যদি সে বিতর্ক হারাম ব্যাপারে না হয়। যদি কারও উদ্দেশ্য সামান্য কথায় হাসিল হয়ে যায়, যার জন্যে কোন শ্রম স্বীকার করতে হয় না, কিন্তু কথাটি কোন সম্মানী কিংবা প্রতিপত্তিশালীর মুখ দিয়ে উপকারী হয়; যেমন রাজকর্মচারী কিংবা উজির মুখ দিয়ে দারোয়ানকে বলে দেয়া যে, এই ব্যক্তি এলে তাকে বাধা দিয়ো না, তবে এর বিনিময়ে কিছু নেয়া হারাম। কেননা, প্রতিপত্তির বিনিময়ে কিছু নেয়ার বৈধতা শরীয়তে প্রমাণিত নেই; বরং এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে।

যে ব্যক্তি কোন ওষুধ জানে, যা অন্যে জানে না, তা বলে দেয়ার বিনিময় নেয়াও এ পর্যায়ে হারাম। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি এমন এক ওষুধীর কথা জানে, যা অর্শ্বরোগে ফলপ্রদ, কিন্তু মজুরি ছাড়া কাউকে তা বলে না, এরূপ মজুরি নেয়া জায়েয নয়। কেননা, সামান্য মুখ নেড়ে দেয়ার কোন মূল্য হতে পারে না। হাঁ, এই ওষুধীর জ্ঞান অর্জন করতে যদি তার অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে পরিমিত মজুরি নেয়া জায়েয।

(৪) অন্যের মহব্বত লাভ করার উদ্দেশে দেয়া। অর্থাৎ, যাকে দেয়া হয় তার অন্তরের মহব্বত লাভ করা এবং এই মহব্বতের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিল না করা। এরূপ দেয়া শরীয়তে মোস্তাহাব ও কাম্য। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ تهادوا وتحابوا (পারস্পরিক উপঢৌকন আদান-প্রদান কর এবং পরস্পরের বন্ধু হও।) সারকথা, যদিও মানুষ মহব্বতের জন্যেই মহব্বত করে না; বরং উপকারের লক্ষ্যেই মহব্বত করে থাকে, কিন্তু যখন উপকার নির্দিষ্ট না থাকে এবং বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে উপকার লাভের কোন নির্দিষ্ট প্রেরণা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তখন যা দেয়া হয় তাকেই হাদিয়া বলে। এই হাদিয়া গ্রহণ করা হালাল।

(৫) প্রতিপত্তি ও জাঁকজমকের কারণে কাউকে হাদিয়া দেয়া, যাতে তার আন্তরিক নৈকট্য ও মহব্বত লাভ করা যায়, ফলে নিজের সীমিত অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ সাধিত হয়। যদি এই প্রতিপত্তি জ্ঞানগত অথবা

বংশগত হয়, তবে এর বিনিময়ে হাদিয়া গ্রহণ করা মাকরূহ। কেননা, এটা বাহ্যতঃ হাদিয়া হলেও ঘুষসদৃশ। আর যদি এই প্রতিপত্তি শাসন ক্ষমতার প্রতিপত্তি হয়; যেমন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিচারক, সরকারী পদাধিকারী, যাকাত আদায়কারী অথবা রাজস্ব আদায়কারী হয়– এরূপ না হলে কেউ তাকে হাদিয়া দিত না, তবে এটা ঘুষ, যা হাদিয়ার আকারে পেশ করা হয়। কেননা, দাতার উদ্দেশ্য আপাততঃ নৈকট্য ও মহব্বত অর্জন হলেও একটা বিশেষ স্বার্থবুদ্ধি সামনে রেখেই তা জালেমের জন্যে দেয়া হয়। বলাবাহুল্য, শাসকদের কাছ থেকে অনেক স্বার্থ হাসিল করা যায়। এটা যে নিছক মহব্বত নয়, তার লক্ষণ হচ্ছে, তখন যদি অন্য কোন ব্যক্তি শাসক হয়ে যায়, তবে সেই হাদিয়া পূর্বের শাসককে দেবে না; বরং নতুন শাসককে দেবে। এ ধরনের হাদিয়া কঠোর মাকরূহ, কিন্তু হারাম হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এখানে কারণ পরস্পর বিরোধী। অর্থাৎ, একে খাঁটি হাদিয়া বলা হবে, না এমন ঘুষ বলা হবে যা কেবল প্রতিপত্তিবশতঃ কোন নির্দিষ্ট স্বার্থ হাসিলের জন্যে দেয়া হয়– এটা নিশ্চিত নয়। যখন অনুমানগত মিল একটি অপরটির পরিপন্থী হয় তখন হাদীস কোন একটিকে শক্তিশালী মনে করলে তাই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হাদীসে অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ এক যমানা আসবে, যখন হাদিয়ার নামে হারামকে হালাল মনে করা হবে এবং জনসাধারণকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোরআনে বর্ণিত সুহত কি? জবাবে তিনি বললেন, কেউ কারও কাজ করে দেয়ার পর তার কাছে হাদিয়া আসা। সম্ভবতঃ তাঁর মতে কাজ করার অর্থ এখানে কিছু বলে দেয়া, যাতে কোন কষ্ট হয় না। অথবা মজুরির নিয়ত ছাড়াই দান স্বরূপ কাজ করে দেয়া। এর পর যদি বিনিময় স্বরূপ পরে কিছু আসে, তবে তা নেয়া জায়েয হবে না।

হযরত মসরূক এক ব্যক্তির জন্যে সুপারিশ করলেন। পরে সে তাঁর খেদমতে এক বাঁদী হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করল। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বাঁদী ফেরত দিলেন এবং বললেন ঃ যদি আগে জানতাম তোমার মনে এই

অভিপ্রায়, তবে কখনও তোমার জন্যে সুপারিশ করতাম না। এখন তোমার যতটুকু প্রয়োজন রয়ে গেছে, তাতে একটি কথাও বলব না। হযরত তাউসের কাছে বাদশাহ প্রদত্ত হাদিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ হারাম। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর দু'পুত্র একবার বায়তুল মাল থেকে সম্পদ নিয়ে মুযারাবা স্বরূপ ব্যবসায়ে খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করেছিলেন। তিনি সেই মুনাফা পুত্রদ্বয়ের কাছ থেকে নিয়ে বায়তুল মালে জমা করে দেন এবং বলেন ঃ লোকেরা তোমাদেরকে আমার স্বজন মনে করে এটা দিয়েছে। অর্থাৎ, শাসনগত প্রতিপত্তির কারণে এই মুনাফা অর্জিত হয়েছে। হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-এর পত্নী একবার রোম সম্রাজ্ঞীর কাছে সুগন্ধি হাদিয়া প্রেরণ করেন। জওয়াবে সম্রাজ্ঞী তার কাছে কিছু মণিমুক্তা পাঠিয়ে দেন। হযরত ওমর (রাঃ) সেই মুক্তা তার কাছ থেকে নিয়ে বিক্রি করে দেন। অতঃপর সুগন্ধির মূল্য তাকে দিয়ে বায়তুল মালে জমা করে দেন। হযরত জাবের ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বাদশাহদের হাদিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা একে খেয়ানতের মাল আখ্যা দেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) হাদিয়া ফেরত দিলে লোকেরা আরজ করল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদিয়া কবুল করতেন। তিনি বললেন ঃ তাঁর জন্যে সেটা হাদিয়া ছিল এবং আমাদের জন্যে ঘুষ। অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে লোকেরা দিত নবুওয়তের কারণে, শাসনক্ষমতার কারণে নয়। আর আমাদেরকে শাসন ক্ষমতার কারণেই দেয়। এসব হাদীস ও রেওয়ায়েতের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ সেই হাদীসটি, যা আবু হুমায়দ সায়েদী বর্ণনা করেছেন। তিনি রেওয়ায়েত করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইযদ গোত্রের যাকাতের জন্যে একজন কর্মকর্তা প্রেরণ করেন। সে ফিরে এসে কিছু মাল নিজের কাছে রেখে দেয় এবং বলে ঃ এগুলো আমি হাদিয়া হিসাবে পেয়েছি। এর পর অবশিষ্ট মাল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অর্পণ করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি সত্যবাদী হলে তোমার মায়ের গৃহে বসে রইলে না কেন, যাতে এখানে হাদিয়া আসত। এর পর তিনি মুসলমানদের সামনে এই ভাষণ দিলেন ঃ

مالى استعمل الرجل منكم فيقول هذه لكم وهذه لكم وهذا لى هدية ـ الا حبس فى بيت امه يهدى له والذى نفسى

بيده لاياخذ منكم احد شيئا بغير حقه الا اتى الله يحمله فلا يأتين احدكم يوم القيامة ببعير له رخاء او بقرة له خوار او شاة تيعر ـ

অর্থাৎ, ব্যাপার কি, আমি তোমাদের কাউকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করি। সে বলে ঃ এটা মুসলমানদের জন্যে, আর এটা আমার জন্যে হাদিয়া। সে তার মায়ের গৃহে বসে থাকলে কি কেউ তাকে হাদিয়া দিত? কসম সেই সত্তার, যাঁর কব্জায় আমার প্রাণ– তোমাদের যে কেউ অন্যায়ভাবে কিছু নেবে, সে তা বয়ে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে উপস্থিত হবে। অতএব তোমাদের কেউ যেন কেয়ামতের দিন চীৎকাররত উট নিয়ে অথবা হাম্বারবরত গরু নিয়ে অথবা ক্রন্দনরত ছাগল নিয়ে উপস্থিত না হয়। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) উভয় হাত আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন, এমনকি, তাঁর বগলের শুভ্রতা আমার দৃষ্টিগোচর হল। তিনি এরশাদ করলেন ঃ ইলাহী, আমি পৌঁছালাম কি না? মোট কথা, হাদীস ও রেওয়ায়েত দ্বারা যখন এহেন কঠোরতা প্রমাণিত হয়, তখন বিচারক ও কর্মকর্তাদের উচিত, তারা যেন নিজেদেরকে গৃহে উপবিষ্ট মনে করে নেয়। এর পর পদচ্যুত ও গৃহে বসা অবস্থায় যে বস্তু তারা হাদিয়া পায়, চাকুরীরত অবস্থায় তা নেয়া দুরস্ত। আর যে বস্তু সম্পর্কে জানে যে, এটা কেবল শাসনক্ষমতায় থাকা অবস্থায় পাওয়া যায়, সেটা নেয়া হারাম। যদি কোন বন্ধুর হাদিয়ার ব্যাপারে এই মীমাংসা কঠিন হয়, তবে সেটা সন্দিগ্ধ বিধায় পরিহার করা উচিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সঙ্গ, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে মুসলমানদের পারস্পরিক মহব্বত ও ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব একটি উৎকৃষ্টতম বিষয়। মানবিক অভ্যাস ও আচরণ থেকে যেসকল শক্তি উদ্ভূত হয়, সেগুলোর মধ্যে এটি অধিক পবিত্র ও নমনীয়, কিন্তু এর কিছু শর্ত আছে, যেগুলো পাওয়া গেলে মানুষকে আল্লাহর জন্যে বন্ধুর কাতারে গণ্য করা হয় এবং কতিপয় হক আছে, যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখলে এই বন্ধুত্ব মালিন্যের সংমিশ্রণ ও শয়তানী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এছাড়া বন্ধুত্বের এসব হক আদায় করলে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য এবং শর্তসমূহ পূরণ করলে উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়। তাই আমরা এ অধ্যায়টি তিনটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের ফযীলত এবং শর্ত

জানা উচিত যে, সম্প্রীতি সচ্চরিত্রতার এবং বিদ্বেষ অসচ্চরিত্রতার ফল। সচ্চরিত্রতা পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও আনুকূল্যের কারণ হয় এবং অসচ্চরিত্রতা ঘৃণা, শত্রুতা ও বিচ্ছিন্নতার ফল। বলাবাহুল্য, বৃক্ষ ভাল হলে ফলও ভাল হয়। ধর্মে সচ্চরিত্রতার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। সচ্চরিত্রতার কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সাঃ)-এর প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন ঃ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ اكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق যে বস্তু অধিকতর মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করায়, তা হচ্ছে আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্র।

হযরত উসামা ইবনে শরীক বলেন ঃ আমরা আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, মানুষ যা যা পেয়েছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ সচ্চরিত্র।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ بعثت لاتمم محاسن الاخلاق (আমি

সচ্চরিত্রতাকে পূর্ণতা দান করার জন্যে প্রেরিত হয়েছি।) তিনি আরও বলেন ঃ اثقل ما يوضع فى الميزان خلق حسن (দাঁড়িপাল্লায় যা ওজন করা হবে, তার মধ্যে অধিক ভারী হবে সচ্চরিত্র।) তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যার আকার-আকৃতি ও চরিত্র সুন্দর করেছেন, সে দোযখের যোগ্য নয়। একবার তিনি হযরত আবু হোরায়রাকে বললেন ঃ হে আবু হোরায়রা, সচ্চরিত্র নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও। তিনি আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, সচ্চরিত্র কি? জওয়াব হল ঃ যে তোমার কাছ থেকে আলাদা থাকে, তুমি তার সাথে মিলিত থাক। যে তোমার উপর জুলুম করে, তুমি তাকে মাফ কর। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর। শুধু সম্প্রীতির প্রশংসায় এত আয়াত, হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, যা তার শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে যথেষ্ট। বিশেষত ঃ যখন সম্প্রীতির সূত্র খোদাভীতি, ধর্মপরায়ণতা ও আল্লাহর মহব্বত হয়, তখন তো এর শ্রেষ্ঠত্ব সোনায় সোহাগা হয়ে যায়। সম্প্রীতি মানুষের প্রতি একটি নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা এই মহা অনুগ্রহ প্রকাশ করে বলেন ঃ

لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ـ

অর্থাৎ, আপনি পৃথিবীস্থ সবকিছু ব্যয় করেও মানুষের অন্তরে সম্প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন।

বিভেদের নিন্দা ও তা থেকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ـ

অর্থাৎ, তোমরা সকলেই আল্লাহর রজ্জু শক্তভাবে আঁকড়ে ধর এবং বিভক্ত হয়ে পড়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ কর, যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছ।

আর তোমরা জাহান্নামের গর্তের কিনারে দাঁড়িয়েছিলে; তিনি তা থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হও। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

ان اقربكم منى مجلسا احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنانا الذين يالفون ويولفون -

অর্থাৎ, তোমাদের মজলিসে আমার অধিক নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র ভাল, যার অন্তর অন্যের জন্যে কোমল এবং যে অন্যের সাথে সম্প্রীতি রক্ষা করে ও অন্যেরা যার সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখে।

তিনি আরও বলেন ঃ ঈমানদার সম্প্রীতির আচরণ করে এবং তার সাথে সম্প্রীতির আচরণ করা হয়। যে সম্প্রীতি রক্ষা করে না এবং যার সাথে সম্প্রীতি রক্ষা করা হয় না, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের প্রশংসায় বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ করতে চান তাকে সৎ বন্ধু দান করেন। সে ভুলে গেলে বন্ধু তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সে স্মরণ করলে তবে বন্ধু তাকে সাহায্য করে। আরও এরশাদ হয়েছে ঃ যখন ধর্মীয় দু'ভাই মিলিত হয়, তখন তারা দু'হাত সদৃশ, যারা একে অপরকে ধৌত করে। আর দুই ঈমানদার যখন মিলিত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা একেকে অপরের দ্বারা কিছু উপকৃত করেন। আল্লাহর ওয়াস্তে ভ্রাতৃত্বের প্রতি উৎসাহ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশে অপরের সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের এমন স্তরে পৌঁছাবেন, যা অন্য কোন আমল দ্বারা লাভ করা যায় না। আবু ইদরীস খওলানী বলেন ঃ আমি হযরত মুয়ায (রাঃ)-কে বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহর উদ্দেশে মহব্বত করি। তিনি বললেন ঃ তোমাকে সুসংবাদ, পুনঃ সুসংবাদ– আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন কিছু লোকের জন্যে আরশের চারপাশে চেয়ার বিছানো হবে। তাদের মুখমন্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝলমল করবে। সব মানুষ ভীতবিহ্বল হবে, কিন্তু তারা ভীতবিহ্বল হবে না। তারা আল্লাহ তা'আলার ওলী। তারা ভয় ও দুঃখ করবে না। লোকেরা আরজ করল ঃ তারা কারা ইয়া রসূলাল্লাহ? তিনি বললেন ঃ তারা আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতকারী। হযরত আবু হোরায়রা বর্ণিত এই রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে– আরশের

চারপাশে নূরের মিম্বর থাকবে। এই মিম্বরের উপর একদল লোক থাকবে, যাদের পোশাকও মুখমণ্ডল হবে নূরের। তারা নবীও নয়, শহীদও নয়, কিন্তু নবী ও শহীদগণ তাদের ঈর্ষা করবে। লোকেরা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, তাদের গুণাবলী বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ তারা হল আল্লাহর ওয়াস্তে পারস্পরিক মহব্বতকারী। তারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর বৈঠকে বসে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে আলাদা হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করে, তাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়, যে অপরজন থেকে অধিক মহব্বত রাখে। বলা হয়, যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে, তাদের মধ্যে একজনের মর্তবা উচ্চ হলে অপরজনের মর্তবাও তার সাথে উচ্চ করা হবে এবং তাকে প্রথম জনের সাথে সংযুক্ত করা হবে; যেমন সন্তানদেরকে পিতামাতার সাথে এবং এক আত্মীয়কে অন্য আত্মীয়ের সাথে সংযুক্ত করা হবে। কেননা, আল্লাহর ওয়াস্তে ভ্রাতৃত্ব হলে তা আত্মীয়তার চেয়ে কম হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَئٍْ -

অর্থাৎ, আমি তাদের সাথে সন্তানদেরকে সংযুক্ত করে দেব এবং তাদের কোন আমল হ্রাস করব না।

নবী করীম (সাঃ)-এর বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার মহব্বত তাদের জন্যে অবধারিত, যারা আমার খাতিরে একে অপরের কাছে আসা-যাওয়া করে। আমার মহব্বত তাদের জন্যে ওয়াজিব, যারা আমার জন্যে পরস্পরে মহব্বত করে। তাদের জন্যেও আমার মহব্বত জরুরী, যারা আমার খাতিরে একে অপরকে সাহায্য করে। অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

ان الله تعالى يقول يوم القيامة اين المتحابون بجلالى اليوم اظلهم فى ظلى يوم لاظل الا ظلى -

আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন বলবেন ঃ কোথায় আমার প্রতাপের খাতিরে মহব্বতকারীরা, আমি আজ তাদেরকে আমার ছায়ায় স্থান দেব; যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া নেই। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ فى عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجلان تحابا فى الله اجتماعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت له عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انى اخاف الله تعالى ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه ـ

অর্থাৎ, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ছায়ায় স্থান দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না– এক, ন্যায়পরায়ণ শাসক। দুই, যে যুবক আল্লাহর এবাদতে যৌবন অতিবাহিত করে। তিন, যার মন মসজিদ থেকে বাইরে আসার পর থেকে মসজিদে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত মসজিদের সাথেই সম্পৃক্ত থাকে। চার, যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে মহব্বত করে, আল্লাহর ওয়াস্তেই মিলিত হয় এবং তাঁর জন্যেই আলাদা হয়। পাঁচ, যে একান্তে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অশ্রু বহায়। ছয়, যাকে কোন অভিজাত সুন্দরী রমণী প্ররোচিত করলে সে বলে – আমি আল্লাহকে ভয় করি, সাত, যে ব্যক্তি দান করে এবং এত গোপনে করে যে, ডান হাত কি দিল তা বাম হাত জানতে পারে না।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– কোন ব্যক্তি তাঁর (আল্লাহর) জন্যে ভ্রাতার সাথে সাক্ষাত করতে রওয়ানা হলে আল্লাহ তা'আলা তার পথে একজন ফেরেশতা বসিয়ে দিলেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল ঃ অমুক ভ্রাতার সাথে সাক্ষাত করতে। ফেরেশতা বলল ঃ তার সাথে তোমার কোন কাজ নেই? লোকটি বলল ঃ না। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করল ঃ তোমরা কি একে অপরের আত্মীয়? সে বলল না। ফেরেশতা শুধাল ঃ সে তোমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করেছে কি? সে বলল না। ফেরেশতা বলল ঃ তা হলে কেন যাও? সে জওয়াব দিল ঃ আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তাকে মহব্বত করি। ফেরেশতা বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মহব্বত করেন এবং তোমার জন্যে তিনি জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন। হাদীসে আরও বলা হয়েছে– ঈমানের

রজ্জুসমূহের মধ্যে অধিক মজবুত রজ্জু হচ্ছে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করা। এ হাদীসের কারণেই মানুষের কিছু শত্রু থাকা জরুরী, যাদের সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা হবে এবং কিছু বন্ধু থাকা জরুরী, যাদের সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব হবে। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কোন নবীর কাছে ওহী পাঠালেন, তুমি দুনিয়াতে বৈরাগ্য করেছ। এতে তুমি সুখ পেয়েছ। তুমি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার দিকে মনোযোগী হয়েছ। ফলে তোমার ইযযত বৃদ্ধি পেয়েছে। বল, আমার জন্যে কোন শত্রুর সাথে শত্রুতা অথবা কোন বন্ধুকে মহব্বত করেছ কিনা? রসূলে করীম (সাঃ) এই দোয়া করেছেন– ইলাহী, আমার উপর কোন পাপাচারীর অনুগ্রহ রাখবেন না, যে কারণে সে আমার মহব্বত পায়। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ওহী পাঠান– যদি তুমি সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীর বাসিন্দাদের সমপরিমাণ আমার এবাদত কর আর আল্লাহর জন্যে মহব্বত ও আল্লাহর জন্যে শত্রুতা তোমার মধ্যে না থাকে, তবে সে এবাদত আমার কোন উপকারে আসবে না। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ গোনাহগারদের সাথে শত্রুতা করে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত সৃষ্টি কর, তাদের কাছ থেকে দূরে আসার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন কর এবং তাদেরকে নারাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ কর। লোকেরা আরজ করল ঃ ইয়া রুহাল্লাহ, তাহলে আমরা কার কাছে বসব? তিনি বললেন ঃ তাদের কাছে বস, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যাদের বক্তৃতা তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং যাদের আমল তোমাদেরকে আখেরাতের প্রতি আগ্রহান্বিত করে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন– হে এমরান তনয়, সাবধান থাক এবং নিজের জন্যে সহচর অন্বেষণ কর। যে বন্ধু আমার সন্তুষ্টিতে তোমাদের সাথে একমত হয় না, সে তোমার দুশমন। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-কে ওহী পাঠালেন– হে দাউদ, তুমি নির্জন প্রকোষ্ঠে একা থাক কেন? জওয়াব হল– ইলাহী, আমি তোমার খাতিরে সৃষ্টিকে মন্দ জ্ঞান করেছি। এরশাদ হল, হে দাউদ, হুশিয়ার হও এবং নিজের জন্যে বন্ধু অন্বেষণ কর। যে বন্ধু আমার আনন্দে তোমার সাথে একমত নয়, তার সাথে থেকো না। সে তোমার দুশমন। সে তোমার অন্তর কঠোর করে দেবে এবং তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। হযরত দাউদ (আঃ)-এর জীবন

বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করলেন ঃ ইলাহী, এর কি পদ্ধতি যে, সকল মানুষ আমাকে মহব্বতও করবে এবং আমার ও আপনার মধ্যবর্তী সম্পর্কও বজায় থাকবে? আদেশ হল– দাউদ, মানুষের সাথে তাদের চরিত্র অনুযায়ী ব্যবহার কর এবং আমার ও তোমার সম্পর্কের ব্যাপারে এহসান কর। এক রেওয়ায়েতে আছে– দুনিয়াদারদের সাথে তাদের চরিত্র অনুযায়ী এবং আখেরাতওয়ালাদের সাথে তাদের চরিত্র অনুযায়ী মেলামেশা কর। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দনীয় সে ব্যক্তি, যে অধিক সম্প্রীতি-প্রতিষ্ঠা করে এবং যার সাথে অধিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর অধিক ঘৃণিত সে ব্যক্তি, যে কানকথা বলে এবং ভাইয়ে ভাইয়ে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আরও বলা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলার এক ফেরেশতার অর্ধেক দেহ আগুনের এবং অর্ধেক বরফের। সে বলে– ইলাহী, তুমি যেমন বরফ ও আগুনের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছ, তেমনি তোমার নেক বান্দাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি কর। এক হাদীসে আছে– যখন কোন বান্দা আল্লাহর ওয়াস্তে নতুন বন্ধু সৃষ্টি করে, তখনই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্যে নতুন মর্তবা নির্ধারণ করেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, বন্ধু অবশ্যই বানাও। কারণ, বন্ধু দুনিয়াতেও উপকারে আসে এবং আখেরাতেও। দোযখীরা সেদিন বলবে–

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ অর্থাৎ, আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, যদি আমি অবিরাম রোযা রাখি, সারারাত বিনিদ্র এবাদত করি এবং নিজের উৎকৃষ্ট মাল দৌলত আল্লাহর পথে দিয়ে দেই, তবুও মৃত্যুর সময় আমার অন্তরে আল্লাহর অনুগতদের মহব্বত এবং তাঁর নাফরমানদের প্রতি ঘৃণা না থাকলে এসব এবাদত আমার কোন উপকারে আসবে না। ইবনে সাম্মাক (রহঃ) জীবন সায়াহ্নে আরজ করলেন ঃ ইলাহী, আপনি জানেন, আমি আপনার নাফরমানী করলেও আপনার অনুগত বান্দাদেরকে মহব্বত করতাম। ইলাহী, আমার এ অভ্যাসকে আমার জন্যে আপনার নৈকট্যের কারণ করুন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এই বিষয়বস্তুর বিপরীতে বলেন ঃ হে আদম সন্তান! মানুষ যাকে মহব্বত করবে, তার সাথে

থাকবে– এই উক্তি দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। কেননা, তুমি সজ্জনদের মর্তবা তাদের মত আমল না করে পাবে না। ইহুদী এবং খৃষ্টানরাও তো তাদের পয়গম্বরগণকে মহব্বত করে, অথচ তারা তাঁদের মর্তবায় নয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কিছু আমল অথবা সম্পূর্ণ আমল সজ্জনদের অনুরূপ না হলে কেবল মহব্বত উপকারী নয়। হযরত ফোযায়ল (রহঃ) তাঁর কোন এক ওয়াযে বলেন ঃ তুমি জান্নাতুল ফেরদৌসে থাকতে চাও এবং আল্লাহ তাআলার পড়শী হয়ে পয়গম্বর, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহগণের সাথে বাসস্থান কামনা কর, কিন্তু কোন্ মুখে? কোন্ কামনা তুমি ত্যাগ করেছ? কোন্ ক্রোধটি তুমি সংবরণ করেছ? কোন্ সম্পর্কচ্ছেদকারীর সাথে তুমি সম্পর্ক স্থাপন করেছ। কোন্ নিকট বন্ধুর কাছ থেকে তুমি আল্লাহর জন্য দূরে সরে পড়েছ? কোন দূরবর্তী ব্যক্তিকে তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে নিকট বন্ধ করেছ? বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা নিকট হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ ইলাহী, আমি তোমার জন্যে নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, সদকা দিয়েছি এবং যাকাত দিয়েছি। বলা হল ঃ নামায তোমার জন্যে দলীল, রোযা তোমার ঢাল, সদকা ছায়া এবং যাকাত নূর। আমার জন্যে কি করেছ? হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ ইলাহী, বলে দাও তোমার জন্যে আমল কোন্‌টি? এরশাদ হল ঃ তুমি কখনও আমার জন্যে কোন বন্ধুকে বন্ধু এবং শত্রুকে শত্রু বানিয়েছ কি? তখন মূসা (আঃ) জানতে পারলেন, আল্লাহর জন্যে কারও শত্রু হওয়া এবং আল্লাহর খাতিরে কারও বন্ধু হওয়া উৎকৃষ্ট আমল। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি রোকন এবং মকামে ইবরাহীমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সত্তর বছর এবাদত করে, তবুও আল্লাহ তা'আলা তার হাশর সেই ব্যক্তির সাথে করবেন যাকে সে মহব্বত করবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ ফাসেকের সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা রাখা আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ। এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে'কে বলল ঃ আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করি? তিনি বললেন ঃ যার খাতিরে তুমি আমাকে মহব্বত কর, তিনি তোমাকে মহব্বত করুন। এর পর তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ ইলাহী, আমি তোমার কাছে এ বিষয় থেকে আশ্রয় চাই যে, লোকে আমাকে তোমার খাতিরে মহব্বত করবে, আর তুমি আমাকে শত্রু মনে করবে। এক ব্যক্তি দাউদ তায়ীর কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ তোমার উদ্দেশ্য কি? সে বলল

ঃ কেবল আপনার সাক্ষাৎ। তিনি বললেন ঃ তুমি সাক্ষাৎ করে ভাল কাজই করেছ, কিন্তু আমি আমার নিজের অবস্থা চিন্তা করি। যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে, তুমি কে– দরবেশ, আবেদ না নেকবখত যে, মানুষ তোমার সাথে সাক্ষাৎ করে? তবে আমি কি বলব? আমি তো কিছুই নই। এর পর তিনি নিজেকে শাসিয়ে বললেন ঃ যৌবনে তুমি ফাসেক ছিলে। এখন বার্ধক্যে রিয়াকার হয়ে গেছ। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতকারীরা যখন পরস্পরে মিলিত হয়ে একে অপরকে দেখে আনন্দিত হয়, তখন তাদের গোনাহসমূহ ঝরে পড়ে, যেমন শীতকালে বৃক্ষের পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে। হযরত ফোযায়ল বলেন ঃ আপন ভ্রাতার মুখমন্ডল ভালবাসা ও করুণার দৃষ্টিতে দেখা এবাদত।

আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব এবং পার্থিব স্বার্থে বন্ধুত্ব ঃ জানা উচিত, সংসর্গ দু'প্রকার। একটি ঘটনাপ্রসূত; যেমন একে অপরের পড়শী হওয়ার কারণে সংসর্গ হওয়া অথবা পাঠশালায় সঙ্গে থাকার কারণে অথবা বাজারে একত্রিত হওয়ার কারণে কিংবা এক জায়গায় চাকুরী করার কারণে কিংবা সফরসঙ্গী হওয়ার কারণে সংসর্গ হওয়া। অপরটি, যে সংসর্গ ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি করা হয়। এখানে দ্বিতীয় প্রকার সংসর্গ বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কেননা, ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব নিশ্চিতরূপেই এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তাই ইচ্ছাকৃত কর্মেই সওয়াব ও উৎসাহ প্রদান করা হয়। সংসর্গের অর্থ কাছে বসা ও মেলামেশা করা। কাউকে প্রিয় মনে করলেই মানুষ তার কাছে বসে এবং তার সাথে মেলামেশা করে। অপ্রিয় ব্যক্তির কাছ থেকে দূরে সরে থাকাই মানুষের স্বভাব। মানুষের এই মহব্বত চার প্রকার হতে পারে। প্রথম প্রকার, একজন অপরজনকে কেবল তার সত্তার কারণে মহব্বত করা। এটা সম্ভব। কেননা, যখন একজন অপরজনকে দেখবে, চিনবে এবং তার চরিত্র প্রত্যক্ষ করবে, তখন সে তাকে ভাল বলে জানবে এবং অপার স্বাদ অনুভব করবে। ভাল মনে করা মজ্জাগত মিল ও একাত্মতার অনুগামী হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে দেখা যায় দু'ব্যক্তির মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি হয়ে যায়। অথচ এর কারণ না বাহ্যিক লাবণ্য হয়ে থাকে, না অভ্যাসের সৌন্দর্য হয়ে থাকে; বরং এর কারণ হয় অন্তর্গত মিল ও সাদৃশ্য। এই অন্তর্গত মিল ও সাদৃশ্য গোপন বিষয় এবং এর কারণসমূহও মানুষের অজানা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিম্নোক্ত হাদীসে এ রহস্যই বর্ণনা করেছেন–

الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف۔

অর্থাৎ, আত্মাসমূহ সৈনিকের ন্যায় একত্রিত রয়েছে। তাদের মধ্যে যারা আদিকালে পরস্পর পরিচিত হয়, তারা দুনিয়াতে পরস্পর সম্প্রীতি স্থাপন করে। আর যারা অপরিচিত থেকে যায়, তারা একে অন্যের কাছ থেকে আলাদা থাকে।

এতে বলা হয়েছে, পরিচিত না হওয়া পৃথক থাকার এবং সম্প্রীতি মিলের পরিণতি। কোন কোন আলেম এ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন– আল্লাহ তা'আলা আত্মাসমূহকে সৃষ্টি করে সেগুলোকে দু'দলে বিভক্ত করেছেন এবং আরশের চারপাশে প্রদক্ষিণ করিয়েছেন। দু'দলের মধ্য থেকে যে দু' দু'জনের মধ্যে পরিচয় হয়ে গেছে, তারা দুনিয়াতেও সম্প্রীতি সহকারে বাস করে। এক হাদীসে আছে– দু'মুমিনের আত্মা এক মাসের দূরত্ব থেকে এসে মিলিত হয়; অথচ তারা পরস্পরকে কখনও দেখেনি। বর্ণিত আছে, মক্কা মোয়াযযমায় এক ভাঁড় মহিলা ছিল। মদীনায়ও অমনি আরেক মহিলা ছিল। মক্কার ভাঁড় মহিলা একবার মদীনায় গিয়ে ঘটনাচক্রে মদীনার ভাঁড় মহিলার গৃহে অতিথি হয়ে একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হল এবং তাঁকে খুব হাসাল। হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কার গৃহে মেহমান হয়েছ? সে বলল ঃ অমুক মহিলার গৃহে। হযরত আয়েশা বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার রসূল সত্যই বলেছেন– الارواح جنود الخ

অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয়, পারস্পরিক মিলের ফলেই সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। মন এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চরিত্রের মধ্যে মিল হওয়া বোধগম্য, কিন্তু যেসব কারণে এই মিল হয়, তা আবিষ্কার করা মানুষের সাধ্যের অতীত। জ্যোতির্বিদরা এ ব্যাপারে যেসব কথা বলে, তা প্রলাপোক্তি ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং যে রহস্য মানুষের সামনে প্রকাশ করা হয়নি, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি? কেননা, মানুষকে জ্ঞান অল্পই দান করা হয়েছে। অবশ্য এ বিষয়টি বুঝার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি কোন মুমিন এমন মজলিসে যায়, যেখানে একশ মোনাফেক এবং একজন মাত্র মুমিন রয়েছে, তবে সে মুমিনের কাছেই গিয়ে বসবে। পক্ষান্তরে যদি কোন

মোনাফেক এমন মজলিসে যায়, যেখানে একশ' জন মুমিন ও একজন মাত্র মোনাফেক রয়েছে, তবে সে সেই মোনাফেকের সাথেই গিয়ে বসবে। এতে বুঝা যায়, বস্তুর আকর্ষণ তার অনুরূপ বস্তুর প্রতি থাকে। হযরত মালেক ইবনে দীনার বলতেন ঃ দশ ব্যক্তির মধ্যে দু'জনের ঐকমত্য তখনই হবে, যখন একের মধ্যে অপরের কোন গুণ বিদ্যমান থাকবে। মানুষের আকার-আকৃতি পক্ষীকুলের জাত ও শ্রেণীর মত। উড়ার কাজে দুই জাতের পক্ষী কখনও একমত হয় না এবং মিল ছাড়া তাদের উড্ডয়ন এক সাথে হয় না। সেমতে প্রসিদ্ধ উক্তি আছে-

کبوتر باکبوتر باز باباز ـ کند همجنس با همجنس پرواز

অর্থাৎ, কবুতর কবুতরের সাথে, বাজপাখী বাজপাখীর সাথে এবং এক জাতের পক্ষী তার সমজাতীয় পক্ষীর সাথে উড়ে।

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রঃ) একদিন কাককে কবুতরের সাথে উড়তে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন, যে, এরা কিরূপে সঙ্গী হল। এরা তো এক জাতের নয়। এর পর গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলেন, এরা উভয়েই খোঁড়া। কাজেই এরা একমত হয়ে গেছে। তাই জনৈক দার্শনিক বলেন, প্রত্যেক মানুষ তার সমআকৃতির মানুষের সাথে সখ্যতা স্থাপন করে,। যেমন পাখীরা তাদের সমজাতের সাথে আকাশে উড়ে। দুব্যক্তি কয়েকদিন একত্রিত থাকলে তারা যদি সমআকৃতিবিশিষ্ট না হয়, তবে অবশ্যই পৃথক হয়ে যাবে।

মোট কথা, মানুষের পারস্পরিক মহব্বত কখনও তার সত্তার কারণে হয়- বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের কোন ফায়দার কারণে নয়। বরং অন্তর্গত মজ্জা ও গোপন চরিত্রই মানুষকে এই মহব্বতে উদ্বুদ্ধ করে। রূপলাবণ্যের মহব্বতও এর অন্তর্ভুক্ত। যদি তাতে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য না হয়। কেননা, কাম-প্রবৃত্তি ছাড়াও সুন্দর মুখাকৃতি স্বতন্ত্রভাবে আনন্দদায়ক হয়ে থাকে। ফলমূল, কলি, পুষ্প, লাল রঙ মিশ্রিত সেব, প্রবাহমান পানি এবং সবুজের মেলা দৃষ্টিকে প্রচুর আনন্দ দান করে। অথচ এগুলোর সত্তা ছাড়া অন্য কোন কুবাসনা মাঝখানে থাকে না। এই মহব্বত মজ্জাগত, খাহেশপ্রসূত এবং খোদাদ্রোহীদেরও হয় বিধায় আল্লাহর জন্য মহব্বত এর অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু এই মহব্বতের মধ্যে কোন কুউদ্দেশ্য ঢুকে পড়লে তা মন্দ হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ হালাল নয় এমন সুন্দরী মহিলাকে কামপ্রবৃত্তি

চরিতার্থ করার উদ্দেশে মহব্বত করা। আর যদি কোন উদ্দেশ্য না ঢুকে তবে এই মহব্বত বৈধ- প্রশংসনীয়ও নয়, নিন্দনীয়ও নয়। বলাবাহুল্য, মহব্বত তিন প্রকার- প্রশংসনীয়, নিন্দনীয় ও বৈধ।

দ্বিতীয় প্রকার মহব্বত হল, কোন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে একজন অপরজনকে মহব্বত করা। এই মহব্বত উদ্দেশ্যের মাধ্যম হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, প্রিয় বস্তুর মাধ্যমও প্রিয় হয়ে থাকে। যে ব্যক্তিকে অন্য বস্তুর খাতিরে মহব্বত করা হয়, প্রকৃতপক্ষে শুধু সে প্রিয় নয়, বরং অন্য বস্তুটিও প্রিয় হয়ে থাকে। তবে ব্যক্তিটি প্রিয় বস্তুর উপায় বিধায় সেও প্রিয়। এ কারণেই মানুষ টাকা-পয়সাকে প্রিয় মনে করে। অথচ টাকা-পয়সার সত্তার সাথে মানুষের উদ্দেশ্য জড়িত নয়। কেননা, টাকা-পয়সা খাওয়াও যায় না, পরাও যায় না, কিন্তু এটা অন্য প্রিয় বস্তু লাভ করার উপায়। অনেক মানুষের অবস্থাও তাই। অন্যরা তাদেরকে টাকা পয়সার ন্যায় মহব্বত করে। কারণ, তারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হয়ে থাকে। অর্থাৎ, তাদের মাধ্যমে যশ, অর্থ অথবা জ্ঞান অর্জিত হয়। উদাহরণতঃ মানুষ শাসককে এ কারণেই মহব্বত করে যে, তার অর্থ অথবা যশ দ্বারা উপকার হয়। অতএব যে উদ্দেশ্যের জন্যে কোন প্রিয় ব্যক্তিকে মাধ্যম করা হয় তা যদি কেবল পার্থিব হয়, তবে এই মাধ্যমের মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত হবে না। যদি উদ্দেশ্য পার্থিব হওয়ার মধ্যেই সীমিত না হয়, কিন্তু যে মহব্বত করে, তার উদ্দেশ্য যদি কেবলই পার্থিব উপকার হয়, তবে তাও আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত হবে না। যেমন, শাগরেদ ওস্তাদকে এলেম হাসিলের জন্যে মহব্বত করে। এখানে এলেমের উপকারিতা যদিও কেবল পার্থিব হওয়ার মধ্যেই সীমিত নয়; কিন্তু শাগরেদের উদ্দেশ্য যদি তা দ্বারা কেবল দুনিয়া অর্জন ও জনপ্রিয়তা লাভই হয়, তবে তার মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে গণ্য হবে না। অবশ্য যদি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশে এলেম হাসিল করে, তবে ওস্তাদের মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে হবে।

এই মহব্বত দু'প্রকার। একটি নিন্দনীয় ও অপরটি বৈধ। যদি এলেমকে নিন্দনীয় উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় করার নিয়ত থাকে, তবে মহব্বতও নিন্দনীয় হবে। আর বৈধ উদ্দেশ্য নিয়ত থাকলে মহব্বতও বৈধ হবে।